কোন একটি দিকের সন্ধান পাইয়াছেন যাহার সন্ধান পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে হয়ত কোন মতেই সম্ভব ছিল না। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার দর্শনভঙ্গিটির সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ দর্শক এতটা অগ্রসর হইতে পারেননা। তিনি পুরাতন মাপকাঠির সাহায্যে নূতন জিনিষ বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং, বলা বাহুল্য, অতি সহজেই হতাশ হইয়া পড়েন। তাই দেখা যায় চিত্রকরের সঙ্গে দর্শক প্রায়ই চলিতে পারেন না, দর্শককে পিছনে ফেলিয়া চিত্রকর যুগে যুগে সামনের দিকে চলিয়া যান। চিত্রকরের সহিত দর্শকের এই যে দূরত্ব ইহাই সমসাময়িক চিত্রকরদের ছবি বুঝিবার পক্ষে অন্তরায়। চিত্রকলার ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়।

সমসাময়িক চিত্রকরদের ছবি না বুঝিবার মূলে আর একটি ভুল ধারণা রহিয়াছে। সাধারণ দর্শক মনে করেন ছবিতে বাস্তবের নির্দ্দিষ্ট একটি রূপ আঁকা সম্ভব, এই রূপ ফুটাইয়া তোলাতেই চিত্রকরের চরম সার্থকতা। তাঁহার মতে গতযুগের চিত্রকর বাস্তবের এই রূপ ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এযুগে যে সকল চিত্রকর খানিকটা নূতনত্ব সৃষ্টি করেন তাঁহাদের ছবি ভাল না লাগিলেও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু যাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন পথে চলিয়াছেন—সাধারণ দর্শক তাঁহাদিগকে, গ্রহণ করা তো দূরের কথা, সহ্যও করিতে পারেননা।

এ ভুল ধারণারও কারণ এই যে সাধারণ দর্শক পরিবর্ত্তিত দর্শনভঙ্গির সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন না। অবশ্য বয়সের উপর এই সামঞ্জস্য বিধান বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। অল্প বয়সে বিশেষ এক শ্রেণীর ছবি স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইলেও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর ছবি গ্রহণ করিতে বাধেনা, বরং নূতন নূতন ছবি মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু একটি বয়স আছে যাহার পরে নূতন ছবি অনুভূতিকে নাড়া দিতে পারেনা। আগে নূতন ছবি দেখিয়া মনে যে অব্যক্ত আনন্দের ঢেউ উঠিত এখন আর ঠিক তাহা হয় না। এই সময় হইতেই ছবিতে প্রকাশযোগ্য বাস্তবের চরম রূপ সম্বন্ধে মনে একটি ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হইতে থাকে। ইহার পরে সকল রকম নূতন ছবিই চিত্রকরের অর্থহীন দুঃসাহসিকতার নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

এ সম্বন্ধে জনৈক চিত্রকর তাঁহার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বাল্য বয়সে রসেটি মরিস প্রভৃতির ছবি দেখেন এবং সেই সময়েই চিত্রকলা বিচারের একটি মাপকাঠি নিজের মনে মনে ঠিক করেন। কিন্তু উক্ত চিত্রকরদের প্রভাব তাঁহার মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, বয়সের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের প্রসারতা বাড়িতে থাকে। এই সময় তিনি ইম্প্রেশনিস্টদের একটি প্রদর্শনী দেখেন। ইম্প্রেশনিস্টদের ছবি তাঁহার

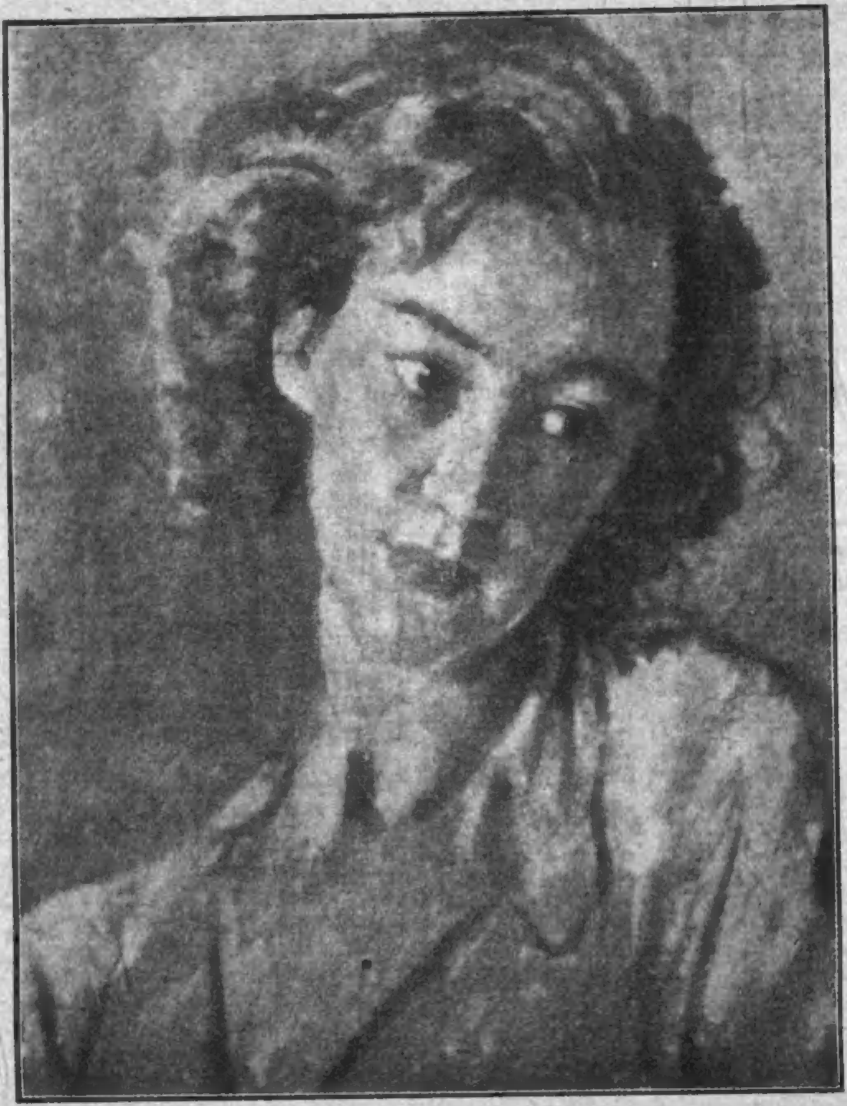

বালিকার মুখাবয়ব

অগাস্টাস জন অঙ্কিত

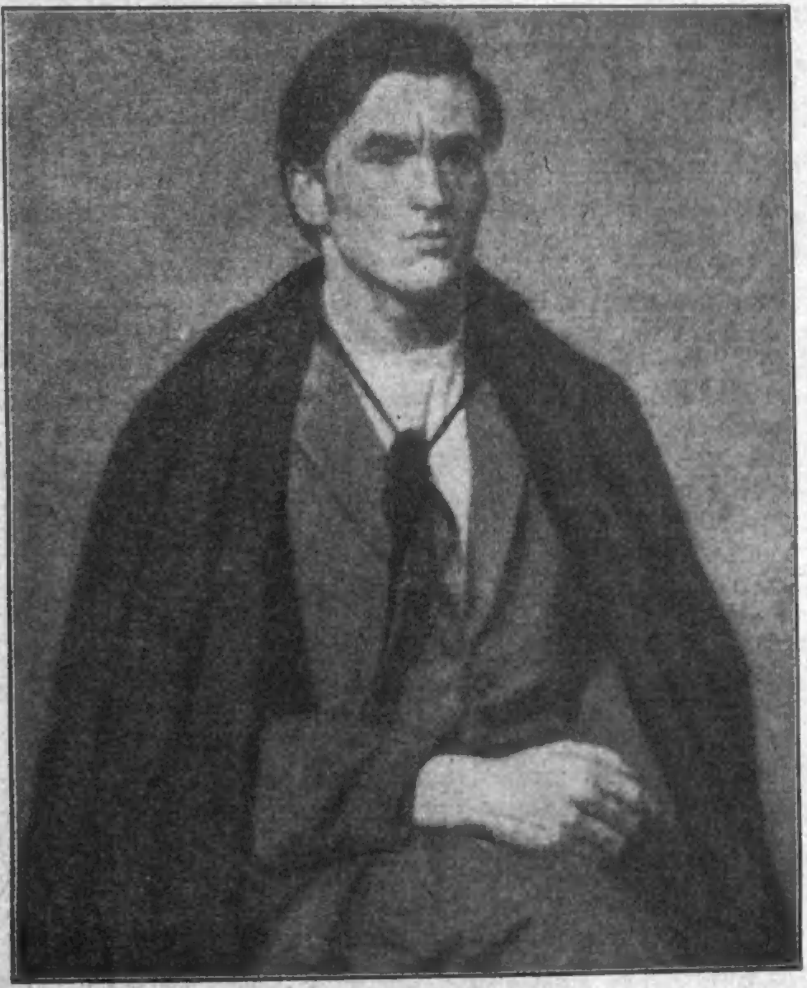

ছাত্রের প্রতিমূর্তি

উইলিয়মারথেনস্টিন অঙ্কিত

মনে এক অপরিসীম বিস্ময় সৃষ্টি করিল। তাঁহাদের আলোক-চঞ্চল পৃথিবীর ছবি তাঁহাকে সম্পূর্ণ নূতন জগতের সন্ধান দিল। রসেটি মরিস প্রভৃতি চিত্রকরদের দর্শনভঙ্গি চিত্রকলার প্রধান ধারা হইতে পৃথক ছিল, কিন্তু ইম্প্রেশনিষ্টদের দর্শনভঙ্গি চিত্রকলার প্রধান ধারাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। তাই তিনি অনায়াসে এই দর্শনভঙ্গি গ্রহণ করিলেন। কম্পমান আলোকে স্নাত পৃথিবীর ছবি আজ কাহারও অপরিচিত নয়, কিন্তু যিনি সর্ব্বপ্রথম এই ভাবে পৃথিবী দেখিয়াছিলেন তিনি বিরাট নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায়না। এই ছবি নিশ্চয়ই রুবেন্‌স্‌-এর কাছে দুর্ব্বোধ্য এবং রাফায়েলের কাছে নিছক অর্থহীন বোধ হইত। আবার জোত্তর কাছে ইম্প্রেশনিষ্ট সম্প্রদায়ের ছবি হয়ত ছবির পরিবর্ত্তে কতকগুলি রং হঠাৎ ঢালিয়া পড়িবার মতই মনে হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত চিত্রকর ইম্প্রেশনিষ্টদের অসীম আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পোস্ট ইম্প্রেশনিস্টদের ছবি তাঁহার মনে সন্দেহ জাগাইয়া তোলে। ইহার ফলে ভ্যান্‌গগ্‌ এবং সেজানের ছবি গ্রহণ করিতেও তাঁহার বিশেষ সময় লাগে। যাহাই হউক, নিজের দর্শনভঙ্গির সহিত ইঁহাদের দর্শনভঙ্গির একটি মিলন তিনি সাধন করেন, কিন্তু ইঁহাদের পরে আর কাহারও ছবি তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ তিনি বলিয়াছেন মনের গ্রহণ-ক্ষমতার অভাব। এই অভাবই সমসাময়িক চিত্রকরদের ছবি সম্বন্ধে দর্শকের মনে সাধারণত নানা সন্দেহ সৃষ্টি করে।

গত যুগের চিত্রকরের দৃষ্টিতে এ যুগের ছবি বিচার করা এবং পরিবর্ত্তিত দর্শনভঙ্গির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার ক্ষমতার অভাব প্রমাণ করে যে দর্শকের অনুভূতি তাহার সজীবতা হারাইয়া ফেলিয়া একেবারে নিৰ্জ্জীব নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কম দুঃখের বিষয় নয়। কিন্তু ইহা এড়ানও সহজ নয়। কিন্তু যাহাই হোক্‌না কেন, এমন অবস্থা যদি কোন দর্শকের আসে যখন তিনি নূতন কোন ছবিই গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না তখন চিত্রকরকে দায়ী না করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নিজের অক্ষমতা স্বীকার করা।

চিত্রকলার ইতিহাসে আমরা অনেক নূতন নূতন আন্দোলনের কথা পাই। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন কালে এইরূপ এক একটি আন্দোলনের স্থিতি কালের অপেক্ষা এখনকার আন্দোলনের স্থিতিকাল অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আগেকার দিনে এক একটি আন্দোলন বহুদিন ধরিয়া চলিত, কিন্তু এখন একটির পর একটি আন্দোলন খুব দ্রুত গতিতে আসিতেছে এবং কোনটিই বেশী দিন স্থায়ী হইতেছে না। ইহার ফলে আগে একটি আন্দোলনের সহিত পরিচিত হইবার যে সময় পাওয়া যাইত এখন আর সে সময় পাওয়া যায় না। আমরা যে কোন দেশের প্রাচীন চিত্রকলার দিকে চাহিলে দেখিতে পাই

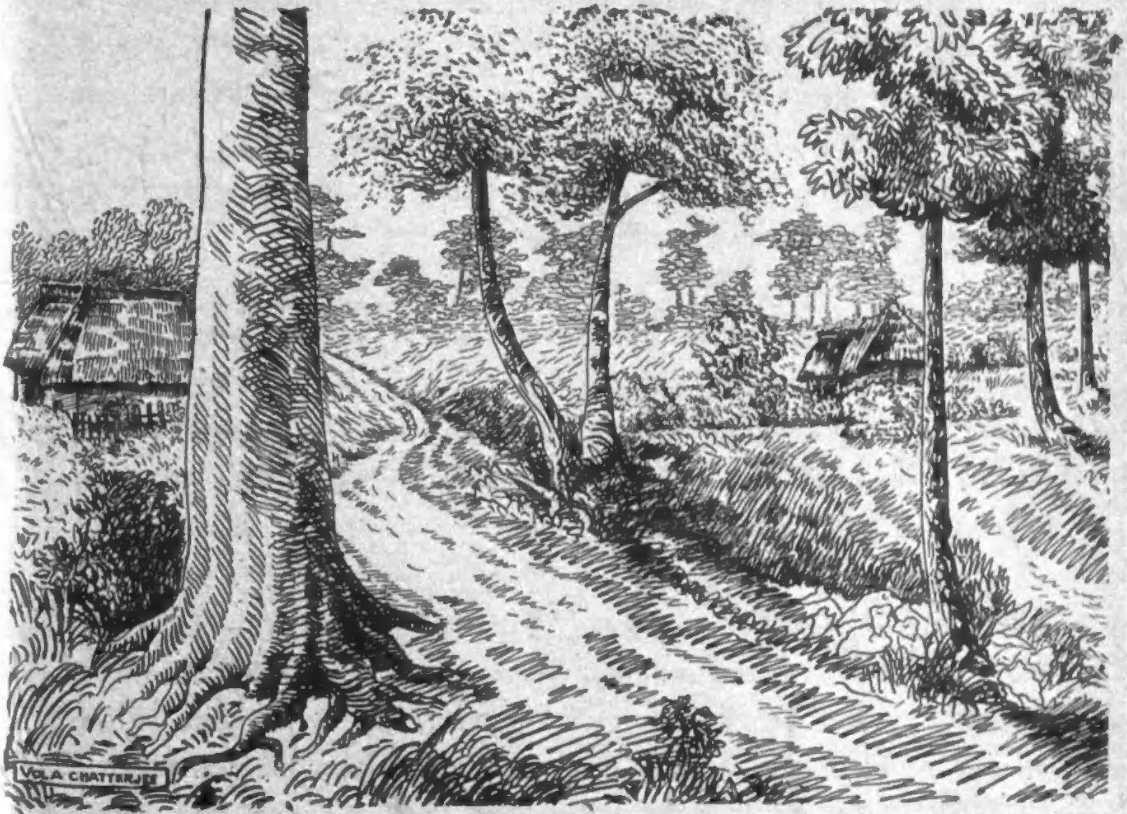
VOLA CHATTERJEE

শহরের বাহিরে ভোলা চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত

চিত্রকলার এক একটি আন্দোলন কোন কোন ক্ষেত্রে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে। হয়ত এই সময়ের মধ্যে বহু নূতন ভাবধারা দেখা দিয়াছে, কিন্তু সেগুলি গাছের শাখা প্রশাখার মত একই কাণ্ড হইতে উদ্ভূত এবং একই রসে সঞ্জীবিত। যুগ পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন চিত্রকরের দর্শনভঙ্গির পার্থক্যের ফলে উক্ত আন্দোলন কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয় সত্য, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন আন্দোলনটিকে পরিপূর্ণতার দিকেই লইয়া যায়, বিপরীত দিকে পরিচালিত করে না।

অতীত হইতে বর্ত্তমানের দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায় চিত্রকলার আন্দোলনগুলির স্থিতিকাল ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে এবং একটি আন্দোলন হইতে আর একটি আন্দোলনের দূরত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় চিত্রকলার গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসের দিকে চাহিলেই ব্যাপারটি প্রণিধান করা যায়। ইউরোপীয় চিত্রকলার একটি আন্দোলন শেষ হইতে না হইতেই আর একটি আন্দোলন উপস্থিত হইতেছে। এ অবস্থায় নূতন আন্দোলনের স্বরূপ বুঝিতে হইলে দর্শনভঙ্গির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ দর্শকের পক্ষে এই পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভব হয়না।

এইখানে একটি মজার জিনিষ পরিলক্ষিত হয়। দর্শকের কাছে প্রাচীন যুগের ছবি আদৃত হয়; প্রাচীন যুগের একখানি ছবি ও আধুনিক যুগের একখানি ছবি পাশাপাশি ধরিলে দর্শক সাধারণত কোন্ ছবি পছন্দ করিবেন তাহা সহজেই অনুমেয়। দর্শকের এই পক্ষপাত সর্ব্বজনবিদিত। তাই দেখা যায় এক দিক দিয়া যেমন নূতন ধরণের ছবি আঁকা হয় তেমনি আর একদিক দিয়া পুরাতন ছবিকে নূতন করিয়া দর্শকের সামনে উপস্থিত করিবার একটি চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহাই পুরাতন পদ্ধতির পুনঃপ্রচলনের গোড়ার কথা। পুরাতন চিত্রকরের পদ্ধতি অবলম্বনে নূতন চিত্রকর ছবি আঁকিতেছেন, দর্শক যে ছবির সহিত পরিচিত নূতন ছবি তাহারই একটি সংস্করণ — ইহা ভাবিতে দর্শকের আনন্দ হয়। দেশ এবং কাল ভেদে পুরাতন পদ্ধতির পুনঃপ্রচলন বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। কোথাও ইহা ক্ষীণ অনুকরণেই শেষ হইয়া যায়, আবার কোথাও বা ইহা বড় একটি আন্দোলনে পর্য্যবসিত হয়। এ সব আন্দোলন যে কেবল মাত্র দর্শকের জন্যই সৃষ্টি হয় এ কথা মনে করা ভুল, চিত্রকরদের মধ্যেও অনেকেই পুরাতন চিত্রকলা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে ছবি আঁকিতে ভালবাসেন। এবং এদিক দিয়া অনেক সময় তাঁহারা দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয়ও দিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা প্রাচীন ভারতীয় অঙ্কন রীতির পুনঃপ্রবর্ত্তনের কথা বলিতে পারি।

যাহা হউক্, পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে ছবি আঁকিবার প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না এবং হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, নূতন যেসকল চিত্রকর আবির্ভূত হন

তাঁহাদের প্রভাবে ধীরে ধীরে পুরাতন ছবির প্রতি আকর্ষণ নষ্ট হইয়া আসে ও সেই সঙ্গে নূতন ছবিগুলি ক্রমশ দর্শকের প্রিয় হইতে থাকে। কালক্রমে এই ছবিগুলিই আবার পুরাতন ছবির শ্রেণীভুক্ত হয়; তখন আবার ইহাদিগকে পুনঃপ্রচলিত করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ছবি কেন, ফ্যাশানের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনি ব্যাপার সংঘটিত হয়। মেয়েদের যে সব অলঙ্কার বহু কাল আগে প্রচলিত ছিল, মাঝে তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল আবার সেগুলির প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। মেয়েদের শাড়ী কিম্বা জুতার ইতিহাসও একই সাক্ষ্য প্রদান করে।

এখানে মনে রাখা দরকার, চিত্রকলার পুরাতন পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি নূতন আন্দোলন দেখা না দেয় তাহা হইলে চিত্রকলার ক্রমবিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং একটি অস্বাস্থ্যকর' আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। আমাদের বর্ত্তমান চিত্রকলার দিকে চাহিলে একথা বিশেষ করিয়া মনে আসে। তাই বলিয়া নূতনত্বের নামে স্বেচ্ছাচারিতা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আন্তরিকতা চিত্রকর এবং দর্শক দুই পক্ষেরই বিশেষ প্রয়োজন।

চিত্রকলার বিশেষ একটি যুগের ইতিহাস তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অঙ্কন-পদ্ধতির পুনঃপ্রচলন ও নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের ইতিহাস। একদিকে রহিয়াছে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ছবির প্রতি দর্শকের আকর্ষণ আর এক দিকে রহিয়াছে নূতন চিত্রকরদের নূতন পথে চলিবার প্রয়াস। দর্শক বাস্তবের যে রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ছবিতে দেখেন, সমসাময়িক চিত্রকরদের ছবিতে তাহা দেখিতে পাননা; দুইজনের দর্শনভঙ্গির ভিতরে একটি পার্থক্য রহিয়া যায় যাহার ফলে একজন আর একজনকে বুঝিতে পারেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যুগে যুগে নূতন চিত্রকর নিজেদের অসামান্য প্রতিভা লইয়া আবির্ভূত হন এবং উপনদীগুলি যেমন করিয়া নদীকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে ঠিক তেমনি করিয়াই ইঁহারা চিত্রকলার সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করেন। চিত্রকলার ক্রমবিকাশের ধারার মাঝখানে দর্শক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, ইহা তাঁহাকে ছাড়াইয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইয়াছে — এই উপলব্ধিই তাঁহার সহিত সমসাময়িক চিত্রকরের দূরত্ব ঘুচাইবে এবং তাঁহার কাছে একটি অভিনব জগতের সন্ধান আনিয়া দিবে।

রিলিফ

কণাদ গুপ্ত

আজকাল সিনেমা বা থিয়েটারে কাহারও দর্শক হইবার দুর্ভাগ্য ঘটিলে তাহার অবস্থা হয় কতকটা নিমন্ত্রণ বাড়ীর শেষ ব্যাচের অতিথির ন্যায় ; লুচি ঠাণ্ডা হইয়াছে, মাংসটা ফুরাইয়া গিয়াছে, চিংড়ির কালিয়ার মাত্র তলানিটুকু অবশিষ্ট আছে, ভাল মিষ্টান্নও বিশেষ নাই, শুধু পাঁপড়ভাজা, চাট্‌নি এবং দই দিয়া কোনওরকমে অতিথিদিগকে বিদায় করিয়া মান রক্ষা করিবার চেষ্টা। সেই জন্য দুই ঘণ্টা বা চার ঘণ্টা ব্যাপী কোনও ট্রাজেডি বা সিরিয়স কমেডি দেখিয়া কিছু গুরুরস বা মিষ্ট রস আহরণ করিবার ইচ্ছা লইয়া যখন সিনেমা থিয়েটারে যাই, তখনও আমাদের ভাগ্যে শুধু কাতুকুতু দেওয়া রিলিফ দৃশ্যের অম্ল রসই জুটে, অন্য যাহা জুটে, তাহা নিতান্তই ওই শেষ ব্যাচের তলানির মত।

রাশিয়ান্ পর্য্যটক লেবেডফ্—যিনি এতদ্দেশে থিয়েটার ব্যাপারে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন্—বাঙ্গালী দর্শকের রুচি সম্বন্ধে তাঁর মুখের একটি উক্তি আছে—

"আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, এদেশীয়রা (বাঙ্গালীরা) গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা—সে যতই বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হউক না কেন—অনুকরণ ও হাসি-তামাসা বেশী পছন্দ করে।"

উক্তিটী বঙ্গবাসীর রসিক স্বভাবের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু রসিক স্বভাবের মধ্যে যে অভাব আছে তাহার পরিচয় আরও বেশী করিয়া দেয় ; কারণ, একথা অতি সত্য যে, রুদ্র রস, বীর রস, শৃঙ্গার রস, করুণ রস—শিল্পী রসদশকের যে কোন রসই পরিবেশন করিতে ইচ্ছা করুন না, হাস্য-রসের খাট্টা মিশাইয়া না দিলে তাহা কিছুতেই আমাদের প্রলুব্ধ করিতে পারে না, আমাদের রসিক চিত্তের জিহ্বা হইতে লালা ক্ষরিত করাইতে পারে না। এইজন্য এখনকার সিনেমা থিয়েটারের নাটকগুলিতে মূল গল্প কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই হাসি এবং রিলিফের বন্যাপ্রবাহে গাম্ভীর্য্য এবং কারুণ্যের দু'টী কুলই নিশ্চিহ্ন হইয়া প্লাবিত হইয়া যায়।

কিন্তু হাস্যরস বস্তুটীর একটী নিজস্ব খেয়াল আছে। যত্র তত্র বিতরণে সে খুসী হয় না। গল্পের তরণীতে দোল খাইতে খাইতে আপনিই যদি কোনখানে ভিড়িয়া পড়ে

তো ভালই, জোর করিয়া, টানা হেঁচড়া করিয়া আনিতে গেলে সে শুষ্ক হইয়া যায়; শুষ্ক হইলে হাস্যরস কাষ্ঠ হাস্যরস হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আজকাল হাস্যরসের উপর এই ধর্ষণ-ক্রিয়াই চলিতেছে। মূল নাটক লিখিত হইবার পর শুধুমাত্র লোক হাসাইবার জন্য (দুই অর্থেই) নূতন দৃশ্য সংযোজিত হইতেছে, নূতন চরিত্র সৃষ্ট হইতেছে। আসলে এই সকল চরিত্র কাতুকুতু দিবার যন্ত্র বিশেষ, এই সকল দৃশ্য মজুরচালিত মটরের ন্যায় গতিশক্তিহীন।

যে সব বহুখ্যাত নাটক ও গল্প নাট্যকার এবং গল্পকারের মৃত্যুর পরও বহুযুগ ধরিয়া জনসমাজকে আনন্দ দিতেছে, সেই সব নাটক ও গল্পেও— গভীর ট্রাজেডি হইলেও যে হাস্যরস নাই, তাহা নয়; পর্যাপ্ত পরিমানেই আছে। কিন্তু যে সব দৃশ্য, সিচুয়েসন্, সংলাপ ও চরিত্রের সাহায্যে এই রসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা কোথাও অবান্তর নয়, নিষ্প্রয়োজনে জোর করিয়া আনা নয়; মূল কাহিনীর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বস্তুত, তাহারা যেন রুচিশালিনী রমনীর মাথার খোঁপা বা পায়ের আল্‌তা, বাদ দিলেই শোভার খর্বতা ঘটে, পরন্তু, জোর করিয়া আনা রিলিফ দৃশ্যগুলি যেন ধনী স্ত্রীর ভারী ওজনের গহনা, বাদদিলেই শোভা খোলে।

ধরা যাক, সেক্সপীয়র। তাঁহার কালে নাটক লেখা হইত দীর্ঘকাল ধরিয়া অভিনীত হইবার জন্য। পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধরিয়া একটানা কোন কিছুই ভাল লাগে না। কাজেই বৈচিত্রের জন্য তাঁহাকে এক আধটা ভাঁড় বা বিদূষক চরিত্র রাখিতেই হইত। কিন্তু এই ভাঁড় বা বিদূষককে তিনি বাহির হইতে চাপাইয়া দিতেন না, গল্পের অনিবার্য অঙ্গ করিয়া সৃষ্টি করিতেন। কিং লিয়রের 'ফুল' কি শুধুই হাসাইবাব যন্ত্র? কন্যাদ্বয়ের বেইমানির ফলে গভীর দুর্দ্দশায় আপতিত রাজা লিয়রের কষ্ট স্মরণ করিয়া আমরা যখন অশ্রুসিক্ত হই, তখন কি সেই কষ্টের একমাত্র সঙ্গী বুদ্ধিহীন অথচ গভীর বুদ্ধিশালী, রসিক অথচ দার্শনিক 'ফুলে'র চিত্রও আমাদের মনে পাশাপাশি জাগিয়া উঠে না?

ম্যাকবেথ অতিশয় দুঃখকর গম্ভীর একটি ট্রাজেডি। ইহার মধ্যে সেক্সপীয়র ভাঁড় আমদানী করেন নাই বা অন্য কোন উপায়েও গল্পের গাম্ভীর্যকে লঘু করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া নাটক হিসাবে কি ম্যাকবেথ কিছু কম উপভোগ্য হইয়াছে?

'হ্যামলেটে' যা কিছু হাসির খোরাক ডেনমার্কের যুবরাজ তাঁহার কপট পাগলামির দ্বারা নিজেই জুটাইয়াছেন। গোরস্থানে অফেলিয়ার কবর-খনক ক্লাউন দুটি যে রুচিহীন লঘুতার পরিচয় দিয়াছিল, হ্যাম্‌লেটের মনে অস্তিত্বের প্রতি বিরক্তি গভীর করিবার জন্য তাহার প্রয়োজন ছিল।

বাংলা ভাষায় গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে হাস্যরসের বাড়াবাড়ি

নাই। 'প্রফুল্ল' 'বলিদান' 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি নাটক যথেষ্ট করুণ, তাই বলিয়া তাহারা কম বুঝে নাই। তবু যে মাঝেমাঝে একটা কর্কশ রুক্ষতার সুর গিরিশের নাটক-গুলিতে বাজিয়া উঠে তাহা রিলিফ দৃশ্যের অভাবে নয়, সংলাপের মধ্যে যথেষ্ট প্রাখর্য ও সরসতা নাই বলিয়া।

দত্তা বা দেবদাসে পৃথকভাবে কোন রিলিফ দৃশ্যের অবতারণা নাই। বিলাস ও রাসবিহারীর চারিত্রিক অসঙ্গতিই মানুষের কৌতুক বোধ উজ্জীবিত করে। সিনেমা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষেরা সেই অবস্থায়ই উপন্যাস দুটীকে কাজে লাগাইয়াছেন। কিন্তু যে সব নাটক ও গল্প তাঁহারা নিজেরা লেখান, তাহার মধ্যে অবান্তর কতকগুলি রিলিফ দৃশ্য জুড়িয়া না দিলেই তাঁহারা মনে করেন ওগুলি চলিবে না।

আসল কথা, নাটক আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইলেই তাহা উপভোগ্য হয়। ইব্‌সেনের Doll's House আগাগোড়া একখানি সমস্যামূলক ট্রাজেডি, কোন ক্ষুদ্রতম রন্ধ্র দিয়াও তাহার ভিতর হাসি প্রবেশ করে নাই। কিন্তু তবু নোরা স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি আমরা আমাদের মনে তাহার জন্য একখানি মৌরসী আসন বিছাইয়া রাখি না? কাতুকুতুর অবতারনা করিয়া এই নাটকের সমুদ্রবৎ গাম্ভীর্য্যকে লঘু করিবার জল্পনা কি অতি বড় ধৈর্য্যশীলও সহিতে পারেন?

পক্ষান্তরে এখনকার একখানি নাম-করা নাটকই ধরা যাক্—শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে'। নাটকখানি দাম্পত্য অসঙ্গতির চমৎকার একটা স্টাডি। স্বামী নৃতত্ব বিশারদ, সকল সময়েই থাকে তাহার মড়ার মাথার খুলি লইয়া। স্ত্রীটির হৃদয়ে অফুরন্ত আবেগ, সেই আবেগকে শান্ত রাখিতে পারে এমন কোন কর্ম তাহার হাতে নাই বলিয়া সে চাহিল স্বামীর হৃদয়াবেগের সহিত নিজের হৃদয়াবেগ বিনিময় করিতে। স্বামীর ভালবাসা আছে, কিন্তু আবেগ নাই, থাকিলেও তাহা মড়ার মাথার ভিড়েই নিঃশেষিত। এমন সময় জুটিল স্ত্রীর এক প্রাক্-বৈবাহিক সাথী। স্বামীর প্রেম সাগর হইয়া স্ত্রীর যে আবেগস্রোতকে আপনার করিয়া লইল না, বিফল হইয়া সে ভিড়িতে চাহিল সাথীর উচ্ছ্বাসের নালায়। অবশেষে ঠিক সময়ে স্বামীর সাংসারিক বুদ্ধি উদয় হওয়ায় চরম বিচ্ছেদ আর ঘটিতে পাইল না।

আর্টের দিক থেকে কিছু কিছু ত্রুটী থাকিলেও নাটকটী কোথাও ঢিলা নয়, গল্পের ঘোড়াকে নাট্যকার কোথাও লাগামছাড়া হইতে দেন নাই। সংলাপ বরাবর তীক্ষ্ণ এবং বিষয়োপযোগী, চরিত্রগুলিও দৃঢ় তুলি দিয়া আঁকা, কোথাও এলোমেলো যত্নহীনতার ছাপ নাই।

সবই ঠিক, কিন্তু ঠিক এই কারণেই বোধহয় নাট্যকারের মনে হইল অথবা থিয়েটারীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে মনে করাইলেন যে, বইটীতে যথেষ্ট রিলিফ নাই—হাসিবার

সামগ্রী নাই, অতএব ছাড় রিলিফ দৃশ্য এবং রিলিফ চরিত্র, লইয়া এস ভৃত্য ভৈরব এবং দাসী ক্ষীরিকে, বলাও তাহাদের মুখ দিয়া এমন সব কথা যাহা শুনিলে দর্শকের পিতামহেরও সাধ্য নাই, হাসি রোখে, ব্যস্, তাহা হইলেই দর্শকেরা খুসী হইবে, বই কাটিয়া যাইবে, থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষের শিরে আশীর্ব্বাদের ধারা বর্ষিত হইবে। এই ভৈরব ও ক্ষীরি কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল, মূল নাটকের সহিত তাহাদের কি বা সম্পর্ক, কোন নাটকীয় প্রয়োজন তাহারা সাধিত করিতেছে, এ সকল কৈফিয়ৎ কেই বা তলব করে, কেই বা দেয়! নাটকের রসভঙ্গ হইয়াছে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি, দর্শকেরা তো রিলিফ পাইল! এখনকার প্রায় সকল ফিল্ম এবং অভিনেয় নাটকেই 'ঝড়ের রাতে'র এই অযাচিত রিলিফদানের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

উদার রিলিফদাতারা কিন্তু এই কথাটী বিস্মৃত হন যে, রিলিফের আপেক্ষিক শব্দ কষ্ট—এক্ষেত্রে কষ্ট না হোক্, বোর্‌ডম বা বেজার ভাব। যেখানে কষ্ট বা বোর্‌ডম, সেইখানেই রিলিফের প্রশ্ন উঠে। উৎসাহী রিলিফদাতারা কি তাহা হইলে এই কথা কবুল করিতে রাজী আছেন যে, মিণ্টে বানানো করকরে সচল টাকাগুলার পরিবর্ত্তে তাঁহারা দর্শকদের কষ্ট বা বোর্‌ডমই পরিবেশন করেন এবং পরিশেষে চালাকী করিয়া খানিকটা রিলিফের চাট্‌নী জুড়িয়া দেন যাহাতে প্রস্থানকালে দর্শকেরা কষ্ট বা বোর্‌ডমের কথা বিস্মৃত হয়?

এমন কথা তাঁহারা নিশ্চয়ই কবুল করিবেন না অথচ রিলিফের পর রিলিফের ঠেলায় দর্শককে যবনিকাপাতের বহু পূর্ব্বে প্রেক্ষাগৃহের বাহিরে ফাঁকা হাওয়ায় পাঠাইয়া তবে ছাড়িবেন।

সত্য, একবার ভাবুন, আপনি সখ করিয়া কোন চিত্রগৃহে বা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, অভিনেয় নাটকের সুখ্যাতি আপনি কিছুটা সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন, কিছুটা বন্ধু বান্ধবের মুখে শুনিয়াছেন, কয়েক দৃশ্য দেখিয়া আপনার মনে হইল নাটকটী বেশ জমিয়া উঠিতেছে, নায়কের চরিত্রের সহিত আপনার চরিত্রের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইলেন, আপনি ভুলিয়া গেলেন যে, যে জর্জ্জেটপরা সুরূপা মেয়েটী (ধরুন) ললিতা হইয়া (ধরুন) রমেশের সঙ্গে প্রগল্‌ভতার সহিত তর্ক করিতেছে, সে ললিতাও নয়, সুরূপাও নয়, আসলে হয়তো বুঁচী নামে কোনও কুদর্শনা বারাঙ্গনা—এক কথায়, আপনার মনভ্রমরা পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে মুক্ত হইয়া নাটকের মধু আহরণে সবে মন দিয়াছে, এমন সময় দৈব অভিশাপের মত মঞ্চে আবির্ভূত হইল কোন মাতাল বা বাঙ্গাল বা তোত্‌লা বা ভৃত্য বাচাল বৃদ্ধ বা এমনি কেহ যাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসারণ মাত্রেই প্রেক্ষাগৃহ

হাসিতে ফাটিয়া পড়িল, হয়তো আপনিও হাসিলেন, কিন্তু দশ মিনিট পরে হাস্যরসের ঝড় কিছু প্রশমিত হইলে আপনি দুঃখের সহিত দেখিলেন, আপনার মন-ভ্রমরার মধু-আহরণ শক্তি লুপ্ত হইয়াছে। নায়কের সহিত আপনার পার্থক্য রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের সমস্যা কেতাবী বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যে সুরূপা জর্জেটপরা মেয়েটীর ললিতা হওয়া আপনার মনে সুখকর ভ্রম উৎপাদন করিতেছিল সে সহসা পুন বুঁচীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক কথায় আপনি রিলিফ পাইয়াছেন, কিন্তু নাটকের রসভঙ্গ হইয়াছে এবং সে ভাঙায় আর কিছুতেই জোড় লাগিতেছে না।

কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল এই রিলিফের? বাজে নাটক বাজারে চালাইতে গেলে রিলিফের প্রয়োজন হয় মানি, কারণ, রিলিফ দৃশ্যগুলি সেখানে হয় দোষ-ঢাকা বস্ত্র। কিন্তু জমাট নাটক হইলেও কি অভিনয় দেখিতে দর্শকের ক্লান্তি আসে? নাটকের দুঃখকর ঘটনা যাহাদিগকে পীড়িত করিতেছে, তাহারা আমি নয়, আমার আত্মীয় নয়, আমার প্রতিবেশী নয়, বাস্তবলোকের কোন অধিবাসীই নয়, তাহারা অবাস্তব, তাহারা কথালোকের জীব— এই নিশ্চিত চেতনাটুকুই কি যথেষ্ট রিলিফ নয়? সংসার হইতে রিলিফ পাইব বলিয়া নাটক দেখিতে যাই। সেই নাটকেও যদি রিলিফ দেওয়া হয়, তাহা হইলে পুনরায় তো সংসারের পাল্লাতেই পড়িতে হয়। গ্রীক সমালোচক আরিসটটল্ বলিয়া গিয়াছেন, অবাস্তব সংঘাতে অংশ লইয়া মনের ভার লাঘব করিলে বাস্তব সংঘাত আমাদিগকে তত কাবু করিতে পারে না, এইখানেই ট্রাজেডির সার্থকতা। তাই যদি হয়, ট্রাজেডিকে রিলিফ দিয়া লঘু করিয়া লইলেই কি এই সার্থকতার বিঘ্ন ঘটে না? অথচ এ দেশে শুধু-ট্রাজেডি নয়, মিলনান্ত নাটকেও রিলিফ দিবার জন্য বেশ একটু ব্যগ্রতা দেখা যায়। গান—এই সঙ্গীতপ্রিয় দেশে যাহা নরনারী ভদ্রেতর নির্বিশেষে সকলের কাছে সমান আদরণীয়, রিলিফের বাহন করিয়া তাহাকেও খেলো পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। আজকাল সিনেমা থিয়েটারে গান বাহুল্যের কথা শুনিলে বোধ হয় সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদেরাও নাক সিঁটকান।

রিলিফ একেবারে বর্জনীয়, এ কথা বলি না, কিন্তু রিলিফ দিব এই উদ্দেশ্য লইয়া যে বিশেষ রিলিফ দেওয়া হয়, সেই রিলিফই রিলিফের সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। নাটকের জন্য যে চরিত্রের প্রয়োজন নাই তাহা আসিবে না, যে দৃশ্যের প্রয়োজন নাই তাহা সংযোজিত হইবে না, যে সংলাপের প্রয়োজন নাই তাহা বলা হইবে না, সমস্ত নাটকে যত্নপূর্ব্বক এই নিয়মগুলি পালন করাই রিলিফদানের সব চেয়ে বড় গ্যারান্টি। কারণ, এই বিষয়ে এই কথাটীকে যে কেহ ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন যে, ট্রাজেডিই হোক্, কমেডিই হোক্, বাজে কথা বর্জ্জিত, পরিষ্কার, ঝরঝরে কোন গল্প নিজেই একটি রিলিফ, অন্য সমস্তই ভার।

কবিতা

অভ্যুদয়

অজয় ভট্টাচার্য

রাত জেগে জেগে চাঁদেরে চাহিয়া অগণন তারা গুণে
মাটির বক্ষে দাঁড়িয়ে যাহারা করেছে জীবন-পাত,
যাদের লাগিয়া শর অফুরান পঞ্চশরের তূণে
কখন্ তাদেরে বিঁধিয়া নিয়েছে অভিযানী ইস্পাত।

একটি কুটিরে একটি প্রদীপে একটি প্রিয়ার মুখ
পলায়নপর যাদের নয়নে জাগিল নির্নিমেষ,
পদাতিক আর অশ্বক্ষুরের চলনে তাদের বুক
ভেঙ্গে খান্-খান্ ; মরু-ঝঞ্ঝায় উড়েছে তাদের দেশ।

যাযাবর আর অরণ্যে বাস মধুকের মধু পিয়া
ভিৎ হয়ে আছে নগর-তোরণে কূর্ম বরাহ জানে।
মাটির হলুদে লাল সূর্য্যের আল্পনা আঁকি দিয়া
যাত্রীরা অই অনামী কালের রথের রজ্জু টানে।

মৃত্যু আজিকে মুখর হয়েছে ফুজি থেকে আমাজনে
জীবন-গ্রন্থী তাই কি জোরালো সুমেরু কুমেরু মাঝ
ধানের শীষের জয়গান বাজে মেসিনগানে'র রণে
তাজা সবুজের বাঁচার কাহিনী বর্শাফলকে আজ।

ঈশ্বরোত্তর পৃথিবী

সুকোমল বসু

ম'রে গেছে ভগবান ; তুলি নব ভিত্তি
মহামানবেরা গড়ে সাম্যের পৃথ্বী !

পুঁজিবাদী ভগবানে ছিল নির্ম্মমতা
রচে গেছে শুধু ভেদ, মানিতনা সমতা !
সব-হারাদের তরে ছিলনাক বেদনা
কোন দিন বলে নিক—'আহা আর কেঁদনা' !
ভেদ তার সব দিকে—ছ'গজ ও ন'গজে
আকৃতিতে প্রকৃতিতে মাথা আর মগজে !
একই ভূঁয়ে রসভেদ নিম্ব ও আম্রে
এক ভুঁয়ে ভেদনীতি ছিল সে যে কাম্‌ড়ে !
মরে গেছে ভগবান, বেঁচে গেছে ধরণী
সাম্যের চীৎকারে ভরে গেছে সরণী !
বেঁচে র'ল বস্তু, মরেছে আদর্শ
চলিবেনা খুশীমত কোনো উৎকর্ষ ?
আইনে ভাবিতে হবে, দাবীতেও আইনই
চলিবেনা আর কোন পুরাতন কাহিনী !
সব হারা সকলেই ফিরে পাক হারাধন
এই হ'ক চিন্তা এই ভাবো সারাক্ষণ !
কিন্তু এ হারাধন ফিরে পেলে সকলে
পুঁজি তো তাদেরও শেষে এসে যাবে দখলে !
না, না, ছাই ভাব্‌বোনা, স্বাধীন এ চিন্তা—
সাম্যের প্রতিকূল, হ'ক আজ লীন তা' !
বস্তুই মন্ত্র, মোরা শুধু ভাববো
সাম্যই খাঁটী কথা আর সব কাব্য !
কাস্তে ও হাতুড়ী—স্মর এই প্রতীকে
সাম্যের গান গাও মানো সব ক্ষতিকে !
মরে গেছে ভগবান, চুকে গেছে ল্যাঠা তার
বেঁচে র'ক সাম্য, আর মোর স্যাটায়ার !

হাইনে অবলম্বনে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

(Wir seufzen nicht, das Aug ist trocken,)
দীর্ঘশ্বাসে আমরা অনভ্যস্ত,
চক্ষে সাহারা, প্রচুর হাস্য ওষ্ঠে,
ভুলেও কখনো হই না শশব্যস্ত
বাস্তু যদিও কালফণী মণিকোষ্ঠে ॥

হৃদয়শোণিতে স্নাত সে-মন্ত্রগুপ্তি,
মূক যাতনার অলাতচক্রে রুদ্ধ ;
প্রহৃত বুকের মুখরিত নিঃসুপ্তি,
করে না কিন্তু রসনাকে উদ্‌বুদ্ধ ॥

সেই রহস্যে পিহিত জাতক, শ্রাদ্ধ ;
শিশু আর শব জানে তার সারমর্ম্ম ;
তাদের শুধাও, আমি যা লুকাতে বাধ্য,
তার বিবৃক্তি বুঝি বা তাদেরই ধর্ম্ম ॥

বিস্মৃত

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ট্রামের তারের পরে কাক
মেঘের সোণালি আঁশ দূরের আকাশে :
এই নিয়ে আসে দিন
সময়ের তীরগুলো বিঁধে এসে বুকে,
অলক্ষ্য সে আক্রমণ।

ফেণার মানুষ ওড়ে, তারপর বুঝি সারাবেলা,
মন আর মাংস নিয়ে
মানুষের মতো হয়ে উঠি।—
পৃথিবীর সাজ-ঘরে
ভাবি আছে ঠাঁই :
ইটের মুকুটে তার
লোহার পাখায়
বিদ্যুতের ধমনীতে
লেখা আছে মনে হয় এ অখ্যাত নাম ;
বারে বারে ভুলে যাই
আমার প্রভাতে ছিল ট্রামের তারের পরে কাক।

মনে থাকে—মন নেই আছে শুধু মেধা
রক্ত যেন পেশী হয়ে গেছে,
ক্ষুধার ঘামের রৌদ্র জলে
অবিরাম চলে
আয়ুর স্তিমিত পরিক্রমা ;
মরেনা এ অভিমান—
আমরণ আমরা মেসিন।
ভুলে থাকি সুরুর সে সুর,
ভুলে যাই
জীবনের বহু অবকাশে
মেঘের সোনালি রঙ এসেছিল দূরের আকাশে ॥

চতুর্দ্দশপদী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অবশেষে দূর পথ দিলো হাতছানি।
স্খলিত শিথিল পায়ে হই অগ্রসর।
সমস্ত শরীরমন প্রতীক্ষাকাতর।
আকাশ বাতাস ভরে' দুর্য্যোগের বাণী।

রক্তিম মুখের দিকে চেয়ে নিষ্পলক
আর তো কাটে না রাত্রি বাসনা-রঙীন।
অবলুপ্ত জীবনের নিভৃত কুহক—
জনতার হাটে কাটে শূন্যগর্ভ দিন।

সহজ বুদ্ধিতে আর আস্থা নেই তাই
একচক্ষু অদৃষ্টের আছি পদানত।
বিরাট শূন্য তো সঙ্গী রয়েছে সদাই।
ধাবমান দিনগুলি কঠিন, উদ্ধত।
এদিকে ট্রামের শব্দে সহর মুখর।
রেস্তোরায় চা খাওয়া : আর তার পর ?

প্রতিদান

উমা দেবী

তোমার চিন্তায় শুধু বেদনা পেয়েছি
দিনে রাতে। কৃপণের ধনের মতন
দান করে' প্রতিদান চেয়েছি হয়তো
বুঝে নিতে। এর মাঝে যে দীনতা আছে
আমারে সে মনে আরো মলিন করেছে —
করেনি মলিন শুধু, এনেছে ব্যর্থতা
গ্লানি আর অবসাদ। তুমি যা নিলেনা
সেই রত্নহারে আজ ফেলেছি ধূলায়।
হঠাৎ চম্‌কে দেখি হৃদয়ের মাঝে
অসহ্য আনন্দ-জ্যোতি। একটি মণিকা
জীবনের বেদীপরে করে জ্বলজ্বল
সে চাহেনা প্রতিদান আঁধারের কাছে—
অন্ধকার করেছে সে উজ্জ্বল সহসা
এই তার সার্থকতা, এইতো মহিমা।

চোখ

সুশীল রায়

জানো কি, গভীর কালো ওই অপলক ছু'টি চোখ
আমারে ক'রেছে দান স্বপ্নে-রচা মোর কল্পলোক ?
আকাশের প্রতিবিম্ব, সমুদ্রের রহস্যের আদিম অক্ষর
দেখিয়াছি ঘন নীল ওই ছু'টি চোখের ভিতর—
অরণ্য দেখেছি ওথা নিটোল নিথর।

নাম ধ'রে ডাকিনি তো, ইঙ্গিতে ক'য়েছি সুধু : অপূর্ব-লোচনা,
চক্ষের ইসারা দিয়ে ক'রেছ মুখর মোর নীরব রচনা।
অদূর গবাক্ষ হ'তে মোর পানে এক দৃষ্টে চাহি'
হয়ত কহিতে কিছু, মহাকাব্যে যার ভাষা নাহি।

কাল শুনিলাম : তুমি অন্ধ, ওটি পাথরের চোখ—
খাতা বন্ধ ক'রে তাই নীরবে বর্ষণ করি শোক।

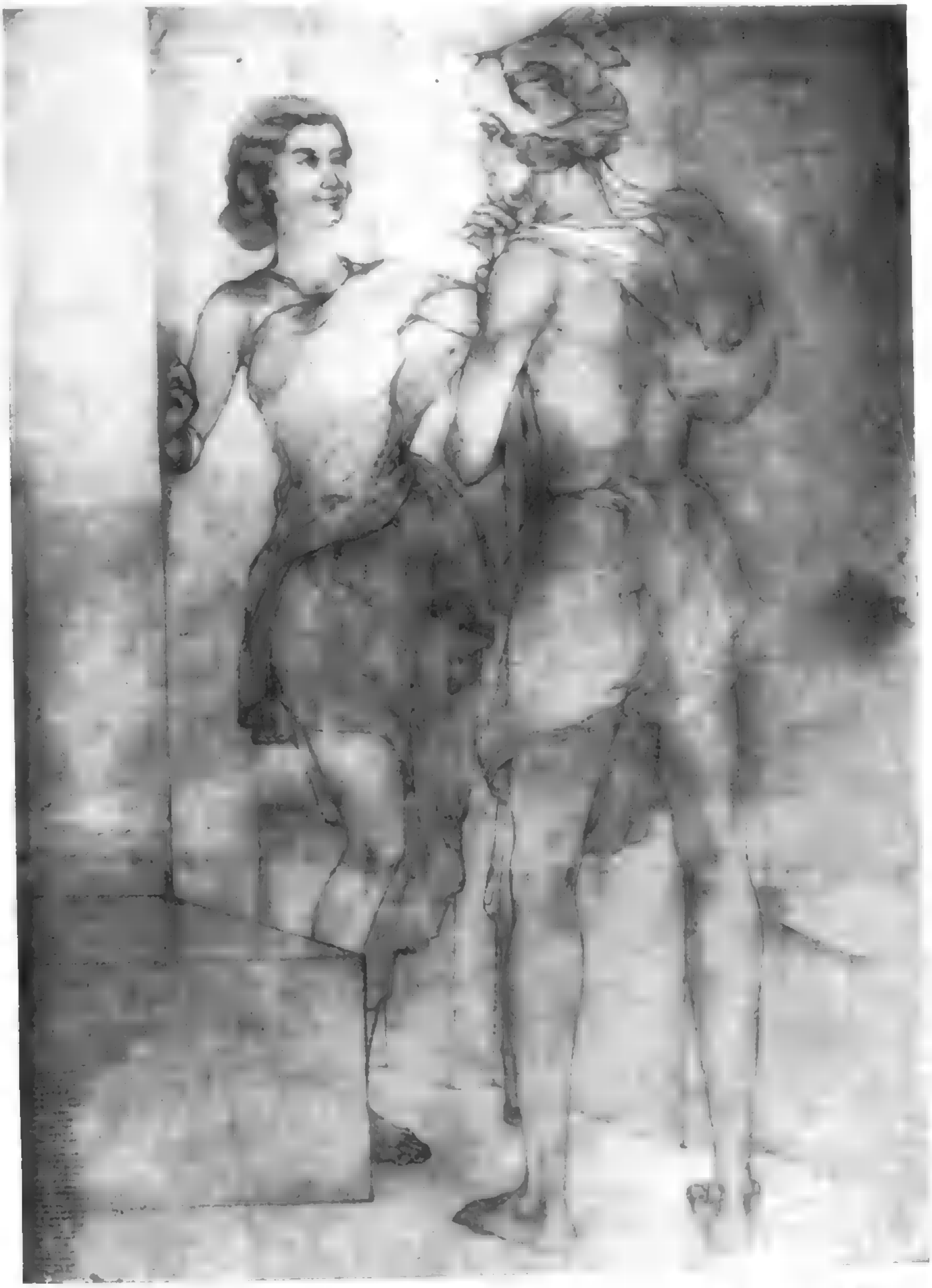

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে চিত্রিত

পথ-মাঝে

—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

Mrs. P. C. Mahalanobis -এর সৌজন্যে

রবীন্দ্র কাব্যে জীবন

গায়ত্রী রায়

রবীন্দ্র তাঁর কাব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত মানব জীবনের জয়গান গেয়েছেন। 'কড়ি ও কোমলে' তিনি ব'লেছেন,

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।"

ধরায় যে 'প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত' তার ওপর রবীন্দ্রনাথের গভীর আকর্ষণ, এর অনিত্যতায় তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। 'ছিন্নপত্রে' তিনি বলেছেন,

"এ রকম ক'রে ভেবে দেখলে (জীবনের অনিত্যতাকে) কোন কোন প্রকৃতিতে বৈরাগ্যের উদয় হয়—কিন্তু আমার ঠিক উল্টো হয়, আমার আরও বেশী ক'রে দেখতে, বেশী ক'রে জান্‌তে ইচ্ছে হয়।"

জীবনকে অতিক্রম ক'রে রবীন্দ্রনাথ সত্যকে দেখার চেষ্টা করেন নাই, জীবনের মধ্যেই তিনি সত্যকে উপলব্ধি ক'রেছেন। তাই মুক্তিপিপাসু মন তাঁর বৈরাগ্য 'সাধনে মুক্তি কামনা করে নাই, ব'লেছে "অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়, লভিব মুক্তির স্বাদ।"

আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ও অনিত্যরূপে প্রতীয়মান এই যে মানবজীবন রবীন্দ্রনাথের কবিমানস একে দেখেছে এক মহান্ অনন্ত জীবনের অংশরূপে, ধরণীর স্বল্প পরিসরটুকুই যার একমাত্র লীলাস্থল নয়।

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন বিহীন।"

মানুষের মহান্ কীর্ত্তির একটা বিশেষ সার্থকতা হয়তো জীবনে আছে, কিন্তু তবু 'তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'। জীবনরথ বার বার তার কীর্ত্তিকে পশ্চাতে ফেলে রেখে গেছে, সে যুগযুগান্তর ধ'রে চ'লেছে

"রাত্রির আহ্বানে,
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।"

মরণকে কবি অস্বীকার করেন নাই, বাস্তবিক জীবনমরণের এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে।

"সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবননির্ঝরিণী মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।"

কিন্তু মৃত্যুই তো জীবনের চরম পরিণতি নয়, এ শুধু অনন্ত জীবনে পৌঁছিবার সিংহদ্বার, জীবনের নূতনতর বিকাশ লাভের সহায়মাত্র।

গীতা ব'লেছে,

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঃ পরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী"।

জীবন মরণের এই অপরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠেছে কবির ভাষায়

"জীবন আমার —
এত ভালবাসি ব'লে হ'য়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

সভ্যতাভিমানী মানবজীবনে প্রকৃতির স্থান আজ হ'য়ে গেছে গৌণ, এর জন্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের অন্ত নেই। বার বার তিনি উন্মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে শান্ত সমাহিত জীবনের প্রার্থনা জানিয়েছেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'।

মানুষের বর্ত্তমান জীবন যাত্রায়, জলে, স্থলে, আকাশে যন্ত্রসভ্যতার বিজয়াভিযান, তাঁর কবিচিত্তকে অপরীসীম বেদনা দিয়েছে। তাঁর সমস্ত অন্তর মথিত ক'রে ক্রন্দন ধ্বনি উঠেছে,

"আর্ত্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন,
শ্যাম বনবীথি পাখীদের গীতি
সার্থক হোক্ পুনঃ"।

কিন্তু সভ্যতার বিজয়াভিযানে প্রকৃতিকে বহুদূরে ফেলে এলেও অন্তরের অন্তস্থলে তার প্রতি এক নিগূঢ় আকর্ষণ আজও মানুষের র'য়ে গেছে—এ সত্য রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

জীবন পথের কুশ্রীতা মলিনতাকে তিনি অস্বীকার করেন নি কিন্তু এই মলিনতাকে চরম সত্য ব'লে মেনে নিতেও তিনি পারেন নি।

"যাহা রুগ্ন, যাহা ভগ্ন যাহা মগ্ন পঙ্কস্তর তলে
আত্মপ্রবঞ্চনা ছলে
তাহারে করিনা অস্বীকার।
বলি বার বার
পতন হ'য়েছে যাত্রা পথে
ভগ্ন মনোরথে;
বারে বারে পাপ
ললাটে লেপিয়া গেছে কলঙ্কের ছাপ;
বার বার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত;
কদর্য্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।"

কিন্তু এ সমস্ত ছাপিয়ে তিনি উপলব্ধি ক'রেছেন জীবনের এক অখণ্ড সুষমাকে বর্ত্তমানে, যখন চারদিকে জীবন ও মনুষ্যত্বের শত অবমাননা চ'লছে তখনও বার্দ্ধক্যের রোগ-জীর্ণকণ্ঠে, মৃত্যুশয্যা থেকে কবি শুনিয়ে গেছেন জীবনের মহান্ সম্ভাবনার বাণী। আদর্শের ব্যর্থতা তাঁর নিজের জীবনেও অপরিসীম বেদনা দিয়েছে,

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—"

জীবনের আরম্ভে কবিচিত্তে উদ্ভাসিত এই মহান্ আদর্শ সম্পূর্ণরূপে সফল ক'রতে সক্ষম তিনি হন্‌নি, এ কথা সত্যি। জীবন সায়াহ্নে এর জন্য তাঁর ক্ষোভের অন্ত নেই।

"মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জীভূত হ'য়ে চোখের সম্মুখে
ছুটিনি করিতে প্রতীকার,
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।"

কিন্তু এ সমস্ত অপূর্ণতা, দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও চিরন্তন মানব জীবনের মহিমাকে শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ধ্বনি দিয়ে গেছেন।

"অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা
গুহাগহ্বরের যতো ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারেনি বিদ্রূপ করিবারে
যতকিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি"।

মানব জীবনের এই বন্দনা রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

"বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়। এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করেনা। স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে বিদ্যা কখনও অক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে নাই।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

আমরা চলচ্চিত্রে কি দেখতে চাই?

পো. চ. রা.

পর্দ্দার সামনে ব'সে দর্শক বায়স্কোপের ছবিতে কি ভাব ফুটে উঠবে তার একটা আন্দাজ যে করে, এমন বলে মনে হয় না। মোটের ওপর, বায়স্কোপে যাওয়ার উদ্দেশ্য, অনেক ক্ষেত্রেই, আমোদ প্রমোদের ভেতর দিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া। যদি এই সময়টা শেষ পর্য্যন্ত ভাল-ভাবে কেটে যায় তাহ'লেই দর্শকের তৃপ্তি। সময় ভাল ভাবে কাটাবার রকম কেমন, সে সম্বন্ধে পরিচালকদের অনেক মাথা ঘামাতে হয়। যে পরিচালক দর্শকের শেষ বিচার কি হবে, সে সম্বন্ধে আগেই যতটা পরিষ্কার ধারণা করে নিতে পারেন, আর সে ধারণা কাজে যতটা ফলিয়ে তুলতে পারেন, তার ওপরই তাঁর সফলতা নির্ভর করে। পরিচালকের কারবার হ'ল দর্শকের মনের সাথে, দর্শকের প্রবৃত্তির সাথে, তাদের রুচির সাথে। এই পণ্য দ্রব্য নিয়ে নাড়াচাড়া করে বাহাদুরীর ওপর দাঁড়াবে তাঁর শিল্প সাধনা, জীবনের প্রতিষ্ঠা। পরিচালদের কারবার ব্যাপক; দর্শকদের তুষ্টি সাধন ক'রে দর্শনী সংগ্রহ করা যেমন তাঁদের কাজ, তেমনি আবার এমন রসদদার তাঁদের যোগাড় করতে হয়, এমন শিল্পীদের খুঁজে বার করতে হয়, যারা তাঁর কল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে সমর্থ হবে। সেনাপতির মত পরিচালকের দৃষ্টি থাকে রণক্ষেত্রের প্রত্যেকটী এবং সমগ্র অংশে। একটি ছোট মাথায় অনেক খানি ঘি না থাকলে পরিচালকের কাজে হাত দেওয়ার সাহস কেউ করতে পারে না—অথবা দুঃসাহস করলেও ঘি-এর মাত্রা যে কম সে সংবাদ ফুটে বেড়িয়ে পড়ে তাঁর নিজের সৃষ্টির ভেতর দিয়ে।

দর্শকের মন নরম মাটির তালের মত, তাকে নিয়ে চতুর শিল্পী বিচিত্র ভাবে রূপান্তরিত করতে পারেন, যত রকম বিচিত্র ভাব কল্পনা করা সম্ভব। মানুষের মনে সব রকমই থাকে লুকিয়ে, তাকে তাক্ মত পাকরাও ক'রে সামনে এনে ফেলার কৌশল রপ্ত করাই হ'ল স্থির সন্ধানী পাকা শিকারীর কাজ। ভাবগুলো যেন নেহাত গোবেচারীর মত থাকে মনের নিরালা কোণে; তারা আদতে কিন্তু তত গোবেচারী নয়, যখন সামনে তাদের আসতে হয়—তখন তারা আসে আবার বড় বেয়াড়ার মত—তখন তাদের সামলে রেখে বাগ্ মানান হয় বড় দায়।

পরিচালকের সঙ্গে সেনাপতির তুলনা সবটা ঠিকমত খাটে না – সেনাপতির বীরত্ব সব সময় পরিচালকের পক্ষে চালান সম্ভব নয়। তাঁকে অনেকগুলি মন বুঝে চলতে হয় – বঙ্গের

বাল্য বধূকে যেমন নব পরিণীতা অবস্থায় অনেক-মন যোগাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় সকল পরিচালককে বাঙ্গলার নবপরিণীতা বাল্য বধূর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

যখন বাংলার প্রসঙ্গ উঠেই পড়ল তখন খাঁটি বাংলা ছবির সম্বন্ধে কিছু আলাপ করার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক।

খাঁটি বাংলা বায়স্কোপের ছবি আম্যদের দেশে যে নাই অনেক দর্শক ও শ্রোতাকে এই সংবাদটাই বড় বেদনা দেয়। খাঁটি জিনিষ পাওয়া শক্ত তা স্বীকার না করেও উপায় নেই, আবার স্বীকার করারও যে বড় বেশী উপায় আছে তাও নয়। ভেজাল যে কোথায়ও পাওয়া যায় একথা কেউ কি স্বীকার করবে? কিন্তু রসদে ভেজাল থাকাতেই যে আমাদের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে একথাই বা কে না বলবে। এ একটা বিচিত্র ঘূর্ণীচক্রের মধ্যে এসে পড়েছি আমরা। আজ আমরা একটা বিপাকে পড়েছি। বাংলা দেশে তোলা বাংলা ভাষায়, বাঙ্গালীর লেখা বই থেকে, বাঙ্গালী পরিচালক, বাঙ্গালী শিল্পী দিয়ে ছবি তৈরী—ভেজালটা কোথায়? কিন্তু, যখন দেখি ভাব হজমে গোলমাল, মনের স্বাস্থ্য হানি তখন ভাবি খাঁটি জিনিষে এমন হ'ল কি করে? যদি দর্শকেরা এ কথা নিজেরা, স্বগত ও নেপথ্যে বলে—'না—খাঁটি বাঙ্গালী ছবি বুঝি দেখতে পেলেম না'—তা হ'লে তাদের গোপন স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার অবকাশ থাকে কোথায়?

ন্যায়শাস্ত্রের তুলা দণ্ডে বিচার করতে গেলে কত রকমারি তর্কের অস্ত্র সন্ধান করা যায় তার ইয়ত্তা নেই! নৃতত্ত্ব থেকে দেখিয়ে দেওয়া যায়—খাটি বাঙ্গালীই কেউ নেই—এমন একটা দ্বিপদ বস্তু ভু-ভারতে কোথায়ও নেই। যদি খাঁটি বাঙ্গালী বলেই কোন পদার্থ না থাকে, তাহ'লে খাঁটি বাঙ্গালী বায়স্কোপের ছবি ব'লে কোন পদার্থের অস্তিত্ব মর্ত্ত্যে থাকতে পারে না, অতএব নেই। থাকতে পারে না পর্য্যন্ত যে সিদ্ধান্ত তাতে অসন্তুষ্ট দর্শক যতটা না আশ্বস্ত হতে পারেন—তিনি যখন এই সিদ্ধান্তটি শোনেন যে অতএব নেই, তখন তিনি 'অতএব' টুকু বাদ দিয়ে 'নেই' টুকু নিয়েই চুপ করেন। এমনিতর নানাভাবের তর্কের শেষ সিদ্ধান্তটুকু অসন্তুষ্ট দর্শকের বড়ই মনঃপূত—কারণ এইটা তাঁদেরই আবিষ্কার যে দেশে খাঁটি বাংলা বায়স্কোপের ছবি নেই।

দর্শক তাহ'লে কোনটিকে খাঁটি বাঙ্গালী ছবি বলবে তা তাকে প্রশ্ন করলেও তেমন ফল হবে না—দর্শক জানেন দেখতে, শুনতেও জানেন—বলতে তেমন জানেন না। তাঁর মন বলে যে তাঁকে যে ছবি দেখান হয় তা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে তাঁর মনের সঙ্গে খাপ খায় না—তবে তাঁর যা উদ্দেশ্য, আমোদ প্রমোদে সময় কাটান—সেটি তাঁর হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান পরিচালক এত সস্তায় মিটিয়ে ফেলার পাত্র নন; তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে যে গভীর

অনুসন্ধানে ব্যস্ত তা খানিকটা আমোদ প্রমোদে সময় কাটান পর্য্যন্ত শেষ হ'তে দিতে পারেন না। তাঁকে ডুবুরীর মত অতি গভীর কন্দরে নেমে মণিমুক্তা তুলতে হবে যে—তাই তিনি যদিও মুখের কথাটা অসন্তুষ্ট দর্শকের কাছ থেকে আদায় করতে পারেন না—তাঁর লক্ষ্য আছে মনের কথাটা বুঝবার। তখন তিনি পরীক্ষার পর পরীক্ষা ক'রে দেখতে থাকেন কোনটিকে অসন্তুষ্ট দর্শক ঠিক নিজের জাতীয় চিত্র বলে শ্রদ্ধা করবে। এমন পরীক্ষার পর পরীক্ষা আমাদের দুর্ভাগা দেশে করা ততটা সহজ নয়, যতটা ভাবা যায়। তাহ'লেও এটা একটা শ্লাঘার কথা যে—দুর্লঙ্ঘনীয় পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আমাদের বাঙ্গালী পরিচালকেরা অনেক দুর্ভোগ হাসিমুখে বরণ ক'রে এগিয়ে চলেছেন। প্রাণের যে দরদ থাকলে অন্তরাত্মার অনুভূতি পাওয়া যায় সেই পরস্পরের অনুভূতি যেদিন এই বাংলা দেশের দর্শক আর পরিচালক,' পরিচালক আর শিল্পী প্রভৃতিতে দেখা দেবে সেদিন গানের লয় পড়ার মত—আনন্দের ফোয়ারা এই মরা গাঙ্গে বাণ ডাকাবে।

কথাটা একটু বিশদ ভাবে বললে এই বলতে হয় যে বাঙ্গালী তার নিজস্ব প্রাণ স্পন্দনের স্পর্শ পেলেই আনন্দে আত্মহারা হয়; এমন আপনভোলা জাতি জগতে বিরল। পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে যাঁরা দেশে ফিরেছেন এমন অনেকের মুখে এই কথা শোনা যায়, বিদেশী পর্য্যটকেরা আবার এই ভাবকে বাঙ্গালী চরিত্রের দুরপণেয় কলঙ্ক বলে মনে করতে বোধ করি সঙ্কোচ করেন না বাঙ্গালী চরিত্রের এই রূপটি যাঁরা দেখেছিলেন আর সকল বাঙ্গালীর সামনে উজ্জ্বল করে ধরেছিলেন, আজও তাঁদের কথা বাঙ্গালীরা সবাই অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, আর সুযোগ পেলেই তার নিদর্শন দেখায়—তাদের জন্য হৃদয়ের দ্বার করে দেয় সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত। খাঁটি বাঙ্গালী, নৃতাত্ত্বিকেরা খুঁজে না পেলেও, ঐতিহাসিকেরা তাঁদের কথা স্বর্ণাক্ষরে বাঙ্গালী-হৃদয়ে খুদে রেখেছেন। রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, আশু- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীমধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আশু- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীমধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়,

আজ চলচ্চিত্র রচনায় প্রকৃত বাঙ্গালী পরিচালকের স্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন তিনিই, যিনি বাঙ্গালীকে কাঁদাতে পারবেন, হাসাতে পারবেন—আর সমগ্র বাঙ্গালীকে এক তালে নাচাতে পারবেন। তাঁর প্রচেষ্টার, তাঁর রচনার, তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট থাকবে বাঙ্গালীর প্রতি একনিষ্ঠ দরদে। তবেই বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্খাকে তিনি পারবেন রূপায়িত করতে, জীবন্ত করতে, গতিশীল করতে। অশিক্ষিত বাঙ্গালী, ছত্রভঙ্গ বাঙ্গালী, নিরন্ন বাঙ্গালী, ক্লিষ্ট বাঙ্গালী, দুঃখী বাঙ্গালী, বাউল বাঙ্গালী এখনও যদি একতিল আনন্দের গন্ধ পায় তাহ'লে পঙ্গপালের মত দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে তাদের আরও সজীব ক'রে, তোলার যে সুযোগ রয়েছে, অবাঙ্গালীপনায় তা কতটা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, চলচ্চিত্র জগতের জ্ঞানী বাঙ্গালী, কর্ম্মী বাঙ্গালীদের, বৎসরান্তে বাঙ্গালী কুঁড়ে ঘরে মা আনন্দময়ীর আগমন-বাসরে আজ বিশেষ ভাবে ভাববার সময় উপস্থিত।

> "গীতিকাব্য অকৃত্রিম কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয় কাননের পুষ্প, আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জ্জিল প্রভৃতি প্রাচীনকালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লিখিতে পারিব না; কেন না সেই প্রাচীনকালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্রিত করতে পারিতেন।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ

স্নরেন্দ্রনাথ মৈত্র

আমার এক প্রবীণ কবিবন্ধু আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠিক বাংলার কবি নন। তাঁর শিকড় যেন দেশের মাটিতে নেই, আছে তুরীয় লোকে। সেই জন্যে তাঁর বাণী পৌঁছয় না দেশের মর্মস্থলে।

মনে পড়ে, উত্তরে বলেছিলাম—সূর্যের ভিতর বটপাকুড় কচুবন গজায় না, ধানের ক্ষেত পুষ্পমালঞ্চ হয় না উদ্ভিন্ন। কিন্তু সবই ফুটিয়ে তোলে এই ধরিত্রীর বুকে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা detachment বা স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি সূর্যের মতই কিরণদান করেন আল্‌গোচে। তাঁর প্রতিভা ইথরেরর ন্যায়, যার মধ্যেই আছে ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুদ্ব্যোম। তবু সেই সঙ্গে রয়েছে একটা ব্যবধান, সেটা আমাদের সঙ্কীর্ণতার অনুপাতে। অথবা হিমালয়ের মত তাঁর উত্তুঙ্গতা, যা 'শুভ্রতুষার কিরীটিনী' এবং 'নীলসিন্দুজল-ধৌত চরণতল' যার দিগন্ত বিস্তার। তিনি তাঁর উর্ধ্ব লোকে আকাশের আলো বাতাস নিঙ্‌ড়ে সঞ্চিত করেন তুষার সম্ভার। সে তুষার গ'লে নামে সহস্র ধারায়, সিন্ধুগামিনী তার গতি, বাংলাকে করে সুজলা, সুফলা, কূলে কূলে বিতরণ করে পূত গঙ্গোদক।

আমাদের জাতীয় জীবন হয়ে পড়েছে—গতানুগতিক, আচার সংস্কারে আটে ঘাটে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন, স্বৈরগতি, নিরঙ্কুশ। অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণে সর্বতোমুখী প্রবর্ত্তনা জাগে। যাঁদের অন্তরে জাগে, তাঁরা মননশীল, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের মগজের সঙ্গে স্নায়ুপেশীর যোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন। সেটা ছিঁড়ে গেছে পারিপার্শ্বিক চাপে এবং সেই বৈদেশিক পরিবৃত্তির প্রভাবে সেটা অনেকটা পরিমাণে তাঁদের স্বেচ্ছারচিত। আমরা আপামর সাধারণে অল্পাধিক পরিমাণে 'নিজবাস ভূমে পরবাসী' হয়ে পড়েছি। দেশীও নই, বিদেশীও নই, একটা আত্মঘাতী স্ববিরোধের মিশ্রণ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল সমন্বয়ের স্বর সংগতি। তিনি স্বদেশের বুকে নলকূপ পুঁতে বৈদিক পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় মুক্তধারা উচ্ছ্রিত করেছেন বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংহতিকে আন্‌তে চেয়েছেন উনপঞ্চাশ বায়ুর বাহনে সংযমের দৃঢ় বল্‌গায় তাদের টেনে রেখে।

হিন্দু সংস্কৃতির যে ছবিটি আজ আমাদের চোখে ফুটেছে সে গৌরবোজ্জ্বল আলেখ্য যদি তিনি আমাদের সম্মুখে না ধরতেন তাহলে আজ আমাদের কী দশা হ'ত জানিনা।

আমাদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চা দিন দিন কমে আসছে যাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ তাঁদের অনেকের সে বৈজ্ঞানিক উদার দৃষ্টি নেই যা এক যুগের অভিজ্ঞতা অনুভূতিকে কালান্তরের প্রেক্ষাভূমিতে উত্তীর্ণ করতে পারে। আমাদের values বা মূল্য নির্দ্ধারণে পরিবর্ত্তন এসেছে। যা শ্রেয় তার স্থান দখল ক'রে বসেছে যা প্রেয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার গুণে। একদিকে যেমন প্রচলিত প্রথার অনুবর্তিতায় ও অন্ধ সংস্কারের অভ্যস্ত স্বীকৃতিতে অতীতের উচ্চাদর্শগুলি প্রাণহীন হ'য়ে পড়েছে, অন্যদিকে বন্যার মত এসে পড়েছে পশ্চিমের সর্বগ্রাসী সভ্যতার তরঙ্গমালা। যাদের শিকড় অতীতের মধ্যেই বদ্ধমূল তারা মাটি কামড়ে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করে। যাদের সে গ্রন্থি শিথিল তারা হয় উৎপাটিত প্রবল আবেগের ধাক্কায়। এরূপ অবস্থায় কেবল আত্মরক্ষা করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা সনাতন আশ্রয় ভূমিকে না হারিয়ে উপস্থিত বিপর্যয়কে বরণ করতে পারেন শুধু অকুতোভয়ে নয়, সোৎসুক সংগ্রহ তৎপরতার সঙ্গে পুরাতন ভিটায় নূতন সংগঠনের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টায় যিনি স্থিতধী, তিনিই শুধু পারেন অটল চরণে দণ্ডায়মান থেকে নবাগতকে যুগপৎ গ্রহণ বর্জনের দ্বারা পরিপাক ক'রে নিতে। এই স্বীকরণ ও বহিষ্করণ সজীব প্রাণের ধর্ম। আমরা সবাই জীবিত, কিন্তু যথার্থ প্রাণবান ক'জন ? রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই সুদুর্লভ প্রাণবত্তায় ঋদ্ধিমান। সে প্রাণ কেবল পূর্বপশ্চিমের সংঘাতের মধ্যে আত্মরক্ষা করেনি, প্রাণের খোরাক সংগ্রহ করেছে বিশ্বভাণ্ডার থেকে, স্বয়ং স্রষ্টা হয়েছে আত্মরূপায়ণে এবং আপনার অপ্রমেয় প্রাণ সম্পদ্ মুক্তহস্তে বিতরণ করেছে বিশ্বমানবের কাছে।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও আশার সঙ্গে অতীতের ঐতিহ্যবুদ্ধিকে তিনি সম্মিলিত করেছেন নব্যসংস্কৃতির সৃজনোল্লাসে। আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জয়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি—উপনিষতের এ মহাকাব্য রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর আনন্দ সত্র নৃত্যগীত ও চারু শিল্পকলার কিছুই বাদ পড়েনি। হলাকর্ষণ ও বৃক্ষ রোপনকে আনন্দময় করবার চেষ্টা করেছেন, ষড়ঋতু মাঙ্গল্য ঘট প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন আমাদের নিরানন্দ বাংলার ঘরে ঘরে ঋতুক্রমার গীতি-উৎসবে।

রস শাস্ত্রে চৌষট্টিকলার নির্ঘণ্ট আছে। মহাদেবের একটি নাম কলাভৃৎ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে কবি ভারতচন্দ্রের একটি পয়ার আছে :

চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি পায়
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।

এই সর্বতোমুখী পরিপূর্ণতা ছিল জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোনার বাংলার জন্যে দেহমনের সমস্ত শক্তি ক্ষয় ক'রে গেছেন। আজ শোকার্ত বাঙ্গালী তাঁর জন্যে সর্বত্র শোক সভার আয়োজন করছে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্যে নানা জল্পনা কল্পনা চলেছে চারিদিকে। স্মৃতি রক্ষার একমাত্র স্থান আমাদের অন্তরে। বাহিরের স্মারক চিহ্ন ও স্মরণোপকরণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা গৌণ।

দুঃখের সঙ্গেই এ কথা বলতে হয়, আমরা অনেকেই তাঁর স্তুতি ও নিন্দা করেছি তাঁর লেখা প্রায় না পড়েই অথবা অল্প পড়ে। দেহ লোকে তিনি আর নেই। তাঁকে আমাদের অন্তর্লোকে আনবার সাধনায় উদ্বুদ্ধ হবার দিন এসেছে। ঘরে ঘরে শিক্ষায়তনে সঙ্ঘসমিতিতে ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠ ও আলোচনায় আমরা অন্ততঃ বৎসর-ব্যাপী কালাশৌচ গ্রহণ করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণ উৎসারিত ক'রে গেছেন গানে গানে। তাঁর ব্রহ্ম সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, প্রেম সঙ্গীত, প্রকৃতি সঙ্গীত রেডিয়ামের বিচিত্র বিকিরণের মত স্বতনিষ্যন্দী, বিদ্যুন্ময়। এই সঙ্গীতের শিক্ষা ও প্রচারের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র উন্মুক্ত হোক।

উচ্চ আদর্শ ও ভাবকে বরণ করবার গুরুতর দায়িত্ব আছে। তার শিক্ষা দীক্ষা আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যথাসাধ্য আনবার জন্যে যদি আমরা বদ্ধপরিকর না হই তবে আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁকে ব্যর্থ করেই তুলব। তাঁর স্মৃতি মন্দির আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে। সে দেউলের প্রাঙ্গন আমাদের পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথের অনুশীলন তাঁর স্মৃতি রক্ষার সর্বোত্তম ও সর্বায়ত্ত উপায়। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের কাছেই এই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের পথ উন্মুক্ত। এই পথে মৌন সঙ্কল্পে আমরা যেন দৃঢ়পদে অগ্রসর হতে পারি।

> "আমাদের আমবাগানে আজকাল আম ফলে না, বিলাতের আপেলবাগানে প্রচুর আপেল ফলিয়া থাকে। আমরা কি তাই বলিয়া মনে করিব যে, আমগাছগুলা কাটিয়া ফেলিয়া আপেলগাছ রোপন করিলে তবেই আমরা আশানুরূপ ফললাভ করিব ?"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

জেম্‌স্ জয়েস্

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ পাঠকের কাছে জয়েসের খ্যাতি অথবা অখ্যাতি এসে পৌঁছেচে তাঁর বহু আলোচিত বই-এর বাহকতায়। কিছুদিন আগে, এমন কি গত পাঁচ-সাত বছর পূর্ব্বেও 'ইউলিসিস্'-এর মৌলিক সংস্করণ অথবা তর্জ্জমা মিলতো জার্ম্মানী এবং ফ্রান্সে। আমেরিকাতে 'ইউলিসিস্' একদা অনেক বিক্রী হয়েছিলো; তার কারণ মার্কিন আদালতের রায় ছিল তার স্বপক্ষে। মানসিক দুর্নীতির অছিলা সেখানে আমল পায় নি; ফলে তার কাট্‌তি ছিলো খুব বেশী। কিন্তু ইংরেজ রাজ্যে যেখানে বইয়ের আর গ্রন্থকারের জন্ম, সেখানে 'ইউলিসিস্' পাওয়া যায় না। জয়েসের শিল্প-আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা নিতান্ত অবান্তর নয়। কারণ সেন্টপল গির্জ্জার শিখরটী বাদ দিয়ে তার বর্ণনা করা যেমন, 'ইউলিসিস্' বাদ দিয়ে জয়েসের সাহিত্য-সমালোচনা করাও তেমনি মুণ্ডহীন শব-ব্যবচ্ছেদ।

'ইউলিসিস্' প্রকাশিত হবার আগে জয়েসের আর দু'খানা বই বেরিয়েছিলো—'চেম্বার মিউজিক' এবং 'একসাইল্‌স্'; কিন্তু এগুলো হ'ল ছাঁটতির সামিল। যদি পার্ণেলের উপরে ন' বছর বয়েসে লেখা প্রবন্ধটি (এর কোনো মুদ্রণই আর পাওয়া যায় না) আর আইরিশ জাতীয় নাট্যশালার ওপরে লেখা রচনাটিকে না ধরা হয়, তা হলে 'চেম্ব্যর মিউজিক'-ই তাঁর প্রথম পুস্তক। ঈলিজবীথান যুগের নকলিয়ানা হিসেবে এ বইখানি সুন্দর; কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য তার নগণ্য। কেবল এটুকু আন্দাজ করা যায়, জয়েসের মনের প্রসার আর স্বাধীনতা কতখানি ছিল। যেহেতু কেল্‌টিক পুনরুজ্জীবনের ধূয়ো যে সময়ে পুরোমাত্রায় চলেছে, সেই সময়ে য়েট্‌স্‌কে না ধরে' তিনি যে হেরিককে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেটা তাঁর সাহসেরই পরিচয়। সেই রকম 'এক্‌সাইল্‌স্' বইখানির সার্থকতা তেমন কিছু বেশি নয়। 'পোর্ট্রেট্ অব্ দী আর্টিস্‌ট্' আর 'ইউলিসিস্'—এ দু'খানা বইয়ের মাঝখানে তার জন্ম। কিন্তু কতকগুলো কৃত্রিম অনুষঙ্গ, বিশেষ করে' বিতথ শব্দ যোজনায় তার নাটকীয় মূল্য নেহাতই কম এবং জয়েসের একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছাড়া আর কারুর কাছে এর আবেদন পৌঁছবে বলে মনে হয় না।

উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে 'ডাব্‌লিনার্স' এবং 'পোর্ট্রেট্ অব্ দী

আর্টিস্ট্' এবং তার মধ্যে প্রথম গল্প-সংগ্রহখানা ১৯০৪ সালে শেষ হয়ে দশ বছর পরে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার কারণ প্রকাশকেরা ভয় পেয়েছিলো এ বই ছাপতে। বইয়ের গোড়ার দিকে প্রথম ক'টি গল্প নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে শেখভের প্রচলিত য়ুরোপীয় গল্পের আঙ্গিক যাঁরা বর্ত্তমানে অনুসরণ করেছেন, সে-সব সাহিত্যিকদের মধ্যে জয়েস্ হলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ বইয়ে তিনি ভালো ভাবেই প্রমাণ করেছেন যে অন্য লেখকেরা যা বলতে বা করতে চেয়েছেন তিনি তাঁদের মতো কিংবা তাঁদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্মভাবে তা কাজে পরিণত করতে পেরেছেন। 'ড্যাব্‌লিনাস'-এর বৈশিষ্ট হ'ল এই যে জয়েস্ মোপাসাঁ-কৃত গল্পবস্তুর যান্ত্রিক মসৃণতা সযত্নে ত্যাগ করে' এমন কতকগুলো চরিত্র সৃষ্টি করতে লাগলেন যাদের অস্তিত্ব আছে গল্পের প্রারম্ভেরও আগে এবং টিঁকে থাকবে তাদের গল্প-জীবন সাঙ্গ হ'বার পরেও। তারা মোপাসাঁর নায়ক-নায়িকার মতো গল্প ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গা খেলনায় পরিণত হয় না। এই উদ্দেশ্য জয়েসের সফল হ'ল কিন্তু তার ফলে তিনি হারালেন আঙ্গিকের ওপর মোপাসাঁর দখল। তাঁর অনেক গল্পই য়্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের চাপে ফেনার বুদ্বুদে ফেটে পড়ে। একমাত্র 'দীডেড্' নামের সর্ব্বশেষ গল্পটিতে এসে জয়েস্ পৌঁছুলেন তাঁর নিজস্ব শিল্প কৌশলে ; তাঁর আঙ্গিক-সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল এমন এক ঘটনার সংস্থানে যাতে সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধে ওঠে একটি নিটোল সন্ধ্যার অনির্ব্বচনীয়তায়। আঙ্গিকের দিক্ থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে এ বইখানা হ'ল স্বাভাবিকত্ব আর আয়াস-অনুশীলনের দ্বন্দ্ব---শেষ গল্পটি যার চমৎকার জবাব। এর মানে অবশ্য নয় যে বইয়ের অন্য গল্পগুলি তাদের শিল্পগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও পরিচ্ছন্ন, জোরালো কিংবা মূল্যবান নয়। 'ড্যাব্‌লিনাস' বইখানার মধ্যেই ভাষার বা প্রকাশভঙ্গীর ক্রমিক বিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। পুরোপুরি বাস্তবধর্ম্মী ভঙ্গী থেকে সুরু করে জয়েস্ ক্রমশঃ বহির্মুখী আর অন্তঃশীল—এ দুই বিভিন্ন ধারার ঘটকতা করেছেন যা তাঁর শেষ দু'খানি বইয়ের এবং অনেক পরিমাণে সমগ্র জীবনেরই বৈশিষ্ট্য বলতে পারা যায়।

জয়েসের বেলায় এ কথা বিশেষ রকমে খাটে যে ছোট গল্পের টেক্‌নিক আয়ত্ত করবার পর তবে তিনি আঙ্গিক-চর্চ্চায় উপন্যাসের দিকে কলম ফেরালেন। আর সেই ছাঁচের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশের অমোঘ ইঙ্গিত যা 'দী ডেড' নামক গল্পটিতে প্রচ্ছন্ন ছিল। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে 'পোর্ট্রেট্ অব্ দী আর্টিস্ট্' 'ইউলিসিস্'-এর চেয়ে বেশি মূল্যবান্। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে মনোরাজ্যের আর বহির্জগতের মাঝখানে যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল তা অপসারিত হ'ল। মনস্তাত্ত্বিক লেখকদের অগ্রণী হওয়ার সমস্যা এই রকমে সমাধান খুঁজে পেল। আগেকার বিশ্লেষণী আধারের পরিবর্ত্তে

এলো চৈতন্যের অন্তর্নিহিত বস্তুর সংবিন্যাস। অর্থাৎ যেখানে পূর্ব্বাচার্য্যের দল দিয়েছিলেন মাত্র কঙ্কাল, জয়েস্ সেখানে আনলেন দেহসৃষ্টির পূরণ। পোর্ট্রেট্ অব্ দী আর্টিস্‌ট্'-এ যে বিশিষ্ট শৈলীর সুষম প্রয়োগ তার সফলতা অনেকখানি প্রমাণিত হচ্ছে এই ভাবে যে, তাকে আর কিছু বিদ্রোহী ভঙ্গিমা বলে মনে হচ্ছে না। জয়েসের প্রদর্শিত পন্থাই আধুনিক লেখকদের পাকা সড়ক।

নতুনত্বের বেশ ছাড়িয়ে আজ অনেক বছরের ব্যবধানে উপন্যাসখানিকে তার প্রকৃত পরিপেক্ষণীতে বিচার করা যায়; এবং আজও তা তেমনি তাজা, সজীব ও যুগোচিত বলে প্রতীয়মান হয়। 'ড্যব্‌লিনাস্' বইতে যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের লীলা, তার সঙ্গে এখানে এসে মিলেছে জটিল মনের ধর্ম্মের অনন্যতা। ঘটনার ব্যাপারের সঙ্গে ঠাসবুনন হয়েছে চিন্তার তথ্যের,—গাঁথা হয়েছে উজ্জ্বল শিল্পের অদৃশ্য প্রক্রিয়ায়। 'ইউলিস্‌স্'-এ বিকসিত হয়েছে যে বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ সুর, তার শিকড় এসে পৌঁছেচে 'পোর্ট্রেট্ অব্ দী আর্টিস্‌ট্'-এ। আমার মতে আগেকার রচনা উপন্যাসটিই আঙ্গিকের দিক্ থেকে আরো উন্নত, কম অপরিচ্ছন্ন, —লঘুভার অথচ পরিণত এবং সমগ্রতার সুব্যঞ্জনে অনেক সুসংস্কৃত। এমন দিন হয়তো আসবে যখন জয়েসের অখ্যাতি 'ইউলিসিস্'-এর ওপর আর তাঁর যথার্থ সুনাম প্রথমতম উপন্যাসের ওপরেই নির্ভর করবে। অন্ততঃ এ কথা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে যদি অধুনাতন সাহিত্যের কিছুটা অংশও দরবারী আমল পায়, তা হলে 'দী ডেড্' এবং 'পোর্ট্রেট্ অব্ দী আর্টিস্‌ট নিঃসংশয়ে স্থান পাবে তাঁর মধ্যে।

> "বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্য্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

মকর সংক্রান্তি

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

২৮শে পৌষের প্রত্যুষে পাড়ায় হঠাৎ একটা হৈ চৈ উঠলো। জানালা অর্দ্ধোমুক্ত করে দেখি, কয়েকটি বৃদ্ধা, দু তিনটি প্রৌঢ়া এবং একটি যুবক দড়ি বাঁধা ঘটি, বিলাতী কম্বল জড়ানো বিছানা এবং গামছার পুঁটলি নিয়ে পথে বের হয়েছেন। পাড়ার দু'তিনটি বাড়ী খালি করে এক যোগে এঁরা কোথায় চললেন? জিজ্ঞাসা করে জানলাম গঙ্গাসাগরে। জানলা বন্ধ করে দিয়ে আবার গায়ে লেপ টেনে দিলাম এবং মুদ্রিত নেত্রে অর্দ্ধ ঘুম অর্দ্ধ জাগরণে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, এই দুরন্ত শীত, হুহু করে সাগুরে হাওয়া বইছে, বন্ধঘরে আরামে থেকেও গায়ের লেপ সরানো দুষ্কর—এমনি আবহাওয়ায় এতগুলো বর্ষীয়সী মহিলা স্বল্পতম আচ্ছাদনে আবৃতা হয়েই অনায়াসে জলপথে গঙ্গাসাগরে চললেন! সেখানে ঘর নেই, বাড়ী নেই, লোকালয় নেই, সাময়িক ভাবে স্থাপিত হোগলার রাশি রাশি ছাউনি, তার একপ্রান্তে নিবিড় বন, অপর প্রান্তে উত্তাল জলরাশি—আর তারই ভেতর লক্ষ লক্ষ লোক, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, উড়ে, মাদ্রাজী—শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী আর পুরুষ, পুরুষ আর স্ত্রী—পিপীলিকার সারির মতো গায়ে গায়ে মাথায় মাথায় একাকার হয়ে' রয়েছে! সমস্ত জেনে শুনেই যাঁরা এই শীত সঙ্কুল জলকল্লোলিত দুর্যমে ঝাঁপ দিলেন, তাঁরা অবশ্যই কোন কিছুর উদ্দীপনা পেয়ে থাকবেন সে কি মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নানের অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন লালসা, অথবা দিনের পর দিন একঘেয়ে বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন জীবনে ক্লান্ত হয়ে, কোন একদিন গৃহ সংসারের অভ্যস্ত শৃঙ্খল ছিন্ন করে, আরামের মোহ কাটিয়ে, দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবনের স্বাদ উপভোগ করবার আকস্মিক নেশা? শুয়ে শুয়ে ভাবতেই লাগলাম। তীর্থযাত্রা দেবদর্শন প্রভৃতির উপলক্ষে হিন্দু নরনারী বিশেষ করে নারী এই যে অন্তঃপুরের অবরোধ ও বর্ণাশ্রমের আঁটুনিকে সাময়িক ভাবেও এড়াবার সুযোগ পান, এ জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য ব'লেই বোধ হয় এদেশে একে ধর্ম্মকার্য্য আখ্যা দিয়ে, সামাজিক ভাবে স্বীকার করিয়ে নেয়া হয়েছে।

হিন্দুর লোকাচার সম্বন্ধে যে যা খুসী বলুন, সত্যকার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে, বাস্তবের বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্টকে মানুষ কখনই এমন হাসিমুখে সহ্য করতে পারে

না। এই অকৃত্রিম আন্তরিকতা যদি মূঢ়তা হয় ত হোক, কারণ জীবনের অনেকটুকু মাধুর্য্যই এর ভিতর নিহিত।

গঙ্গাসাগরে স্নানের কথাই বলি। প্রতি বৎসর সেখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রী মকর সংক্রান্তিতে জড়ো হন। তাঁদের আপদ বিপদ ও অসুবিধা কত রকম! আগেই বলেছি সেখানে ঘর বাড়ী নেই—সাময়িক ভাবে থাকবার জন্য হোগলার ছাউনি বানানো হয়, তারই ভেতর গাদাগাদি করে বসবাস করেন সংখ্যাতীত নরনারী—কোন রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত করে নেন এবং স্বল্পতম কাঁথা কম্বলে শীত নিবারণ করতে বাধ্য হন। এর ওপর আছে আরো রকমারী সঙ্কট—পূর্ণিমা বা অমাবস্যার কোটালে হঠাৎ বান এসে তীরের কতকগুলি ছাউনি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তদ্ভিন্ন আছে হারিয়ে যাওয়া, লুণ্ঠিত হওয়া, দুর্ব্বৃত্তের কবলে পড়া, আরো অনেক কিছুর সম্ভাবনা। যাবার ও আসবার পথে নৌকা যাত্রীদের ডুবে প্রাণ হারানোর ব্যাপারও সাগর গমনের ইতিহাসে নিতান্ত কম নয়। আর দুরন্ত শীত ত আছেই। কিন্তু এত অসুবিধা সত্বেও স্নান যাত্রীদের উৎসাহের বিরাম নেই। প্রতি বৎসরই দেখবেন সমান জনতা, সমান হট্টগোল, সমান আপদ বিপদ!

সেই কারো কন্যা হারিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোকের উন্মত্ত কল্লোলের ভিতর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ খুঁজছে স্বেচ্ছাসেবকগণ ভেঁপু বাজাচ্ছে। ওদিকে সেই হারানো মেয়েটি একই আকারের সারি সারি ছাউনির অরণ্য থেকে নিজেদের অধিকৃত আস্তানাটী আর খুঁজে পাচ্ছে না। নয়ত সেই কোন বৃদ্ধা তাঁর কম্বলের বোঁচকার ভিতর টিকিট ও টাকা-পয়সা রেখে স্নানে নেমেছে, তারপর উঠে এসে আর সেটির দিশা পাচ্ছে না। লক্ষ লোকের ভীড়ের ভিতর আছড়িয়ে পড়ে তারস্বরে চীৎকার করে সে কান্না সুরু করেছে। যেই কারো টাকা দ্বিগুণ করে দেবার ভাওতা দিয়ে কোন সাধুবেশী চোর লম্পট দিয়েছে এবং সেই হৃত সর্ব্বস্ব ব্যক্তিটি কেঁদে-কেটে একাকার করছে। সেই রকমারী ভেল্কী দেখিয়ে পয়সা রোজগার, সেই অধিকতর পুণ্যের পথ বাৎলিয়ে দিয়ে প্রণামী আদায় সবই বছরের পর বছর একভাবে চলছে। এর কোথাও যে সংস্কার সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের কিছু আছে, তা কেউ মনেও করেন না। বাবা কপিল মুনির নাম স্মরণ করে অবগাহন করা মাত্র যেখানে অক্ষয় স্বর্গলাভের দ্বার অবারিত, সেখানে এই সমস্ত দুঃখব্যথার মূল্যই বা কি?

তবু ইদানীং গঙ্গাসাগরে অনেক রকম সুব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতা থেকে সরাসরি সাগর দ্বীপ পর্য্যন্ত অনেকগুলো ষ্টীমার যায় সেই সব ষ্টীমার আবার যাত্রীদের

ফিরিয়ে আনে। যাত্রীদের থাকা খাওয়া নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বচ্ছন্দে চলাফেরার জন্য সেখানে অস্থায়ীভাবে ডাকঘর, থানা, হাঁসপাতাল, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বসানো হয়—বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়, দোকান পসার পাতা হয়, পুলিশ ডাক্তার স্বেচ্ছাসেবক, মজুর, মিস্ত্রী, মেথর দলে দলে পাঠানো হয়। ছাউনি ঠিক করবার জন্য তাদের গায়ে পরের পর নম্বর আঁটা হয়. স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যা কিছু বিজ্ঞান সম্মত উপায়, তাও অবলম্বিত হয়। তথাপি লোক সমাবেশ এত বেশী হয় এবং তার অনুপাতে ব্যবস্থা হয় এত কম যে শেষ পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় না হয়েই পারে না। বলা বাহুল্য যে গঙ্গাসাগরে যায় প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলের নরনারী এবং নাগরিকোচিত নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শুচিশৃঙ্খলা তাদের স্বভাবতঃই কম। সেজন্যেও অসুবিধার পরিমাণ কম বৃদ্ধি পায় না।

কিন্তু যখন এই সব ব্যবস্থা ছিল না, তখনো লোকে গঙ্গাসাগরে যেত এবং ঠিক একই রকম উৎসাহ ও উল্লাস নিয়েই বের হত। পথে নৌকাডুবি হয়ে অনেকে পঞ্চত্ব পেত, অনেকে ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীরের ভক্ষ্য হয়ে সরাসরি স্বর্গে যেত, অনেকে মহামারীর মুখে আত্মসমর্পণ করতো, অনেকে কোথায় যেত তার কোন হদিশই মিলত না। সুন্দরবনের স্থল ভাগ সেদিন ছিল আরো ভয়াবহ, জলপথও ছিল রীতিমতো দুর্গম। লোকালয় সম্পর্কহীন অরণ্যভূমির অন্ধকারে যেখানে গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগর এসে মিলেছে, সেই কাকদ্বীপের মোহনায় সেদিনও আবালবৃদ্ধবনিতা পুণ্যার্জ্জনের আশায় সমবেত হোত।

পুরাণে নাকি আছে ধ্যাননিরত কপিলের সাম্নে যজ্ঞের অশ্ব লুক্কায়িত দেখে সাগর পুত্রেরা মুনির ধ্যান ভঙ্গ করে এবং তাঁর শাপে ভস্ম হয়। তারপর ভগীরথ দুস্তর তপস্যায় তুষ্ট করে গঙ্গাকে মর্ত্তে নামিয়ে আনেন এবং ভস্মীভূত পিতৃপুরুষকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। গঙ্গাসাগরের এই স্নান উৎসব নাকি সেই পুণ্যদিবসের কথা স্মরণ করেই অনুষ্ঠিত হয়। এরই স্মারকচিহ্ন স্বরূপ এখানে কপিলের একটি আশ্রমও রয়েছে। বস্তুতঃ পৌরাণিক বার্ত্তা যাই হোক, সাগর স্নান বাংলার অতি প্রাচীন প্রথা। বোধ হয় কুম্ভমেলা ত্রিবেণী স্নানের মতোই এ পুরাতন। আধুনিক যানবাহনের যখন সুবিধা ছিল না, বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোক বিতরণ ও স্বাস্থ্যরক্ষনের জ্ঞান যখন মানুষের মনে উদিত হয় নি, দলবদ্ধভাবে জনসেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান যখন ছিল অভাবনীয়, সে দিনের সাগর স্নান কি রকম ছিল, তা কল্পনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় সেদিনকার গঙ্গাসাগর যাত্রার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা কে না পড়েছেন? সেই—

জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহ জিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল ভরা তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জ্জিছে নিত্য, করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।

মনে রাখতে হবে, এই সেই বঙ্গোপসাগরের বর্ণনা যার উপকূলবর্ত্তী সুন্দর বনের আওতায় আকবর বাদশার সুশিক্ষিত ফৌজ একদা প্রতাপাদিত্যের হাতে নাকাল হয়েছিল! গঙ্গা-সাগরের সেই ভয়াবহতা আজ নেই, তবু সাগরের নামেই সমস্ত শরীরে কেমন একটা রোমাঞ্চ শিহরণ দেখা দেয়। বোধ হয় সে ঐ অতীত কল্পনার প্রতিক্রিয়া। সেদিন প্রত্যূষে যাত্রীদের কলকোলাহল জেগে উঠে রোমাঞ্চ কল্পনার আনন্দটী আর একবার উপভোগ করলাম। ভাবতে লাগলাম, ওরা যে গেল—সে কি পুণ্যলালসায়, না বাইরে বেরুবার দুর্নিবার মোহে!

> "বিশ্বে ছোটো বড়ো নানা পদার্থ আছে। থাকা-মাত্রের যে-দাম তা সকলের পক্ষেই সমান। নিছক অস্তিত্বের আদর্শে মাটির ঢেলার সঙ্গে পদ্মফুলের উৎকর্ষ অপকর্ষের ভেদ নাই। কিন্তু মানুষের মনে এমন একটি মূল্যভেদের আদর্শ আছে, যাতে প্রয়োজনের বিচার নেই, যাতে আয়তনের বা পরিমাণের তৌল চলেনা। মানুষের মধ্যে বস্তুর অতীত একটি অহৈতুক পূর্ণতার অনুভূতি আছে, একটা অন্তরতম সার্থকতার বোধ। তাকেই সে বলে শ্রেষ্ঠতা।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদকীয়

অবশেষে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসব যথাসম্ভব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হ'লো। রবীন্দ্রনাথের অন্তিমতম ইচ্ছাটি পূর্ণ হওয়ায় সমগ্রভাবে বাঙালী জাতির লজ্জা নিবারণ হ'লো অবশ্যই। রবীন্দ্রনাথের সুপারিশের প্রয়োজন ছিলো কি না বলা যায় না। আমাদের কান সৌভাগ্যবান্‌দের মতো সুদীর্ঘ নয়। এতএব স্বকর্ণে শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি—তবুও সন্দিগ্ধ জনসাধারণের অবগতির জন্যে আমরা এখানে বলতে পারি-যে কবিগুরু এই জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত করার কথা বলেই হতবাক্ ও হতজ্ঞান হন। আমাদের মহা সৌভাগ্য বলতে হবে--তিনি তার পূরো বক্তব্যটি শেষ করতে পেরেছিলেন। দৈবাৎ যদি রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই মূল্যবান মুহূর্তটি হাত ফসকে যেতো!

অবনীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। সংবাদপত্র থেকে জানা গেলো-যে তাঁকে একটি উচ্চ বেদিকার ওপর আসন দেওয়া হ'য়েছিলো, সেখান থেকে নেমে তিনি বিস্তীর্ণ ফরাসের পুরোভাগে আসন গ্রহণ করেন ও বলেন, 'আমার জন্যে একেবারে যেন রাজসিংহাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু অতবড় আসন পাইবার উপযুক্ত আমি নই। সিংহাসনে বসিবার অধিকারী যিনি ছিলেন তিনি চলিয়া গিয়াছেন। শিল্পীদের আসন সবার সাথে ভূতলে—তীর্থের পথের ধারে!' তাঁর ভাষা থেকে মনে হয় তিনি যেন রবীন্দ্রনাথকে অপাংক্তেয় ক'রেছেন—তীর্থের পথের ধার থেকে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সরিয়ে রেখেছেন। যদিও জানি, অবনীন্দ্রনাথের মনের ইচ্ছা তা ছিলো না, তিনি রবীন্দ্রনাথকে অন্তরিক শ্রদ্ধাই করেন : বিশেষত এই অনুষ্ঠানের জন্যে যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে আংশিকভাবে ঋণী। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অভিনন্দনের উত্তরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা ব'লেছেন। ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁর অন্তরিক স্নেহ ও মমতা তাঁর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এই মাতাকে বিস্মৃত হইলে শিল্পীর সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় র‍্যাফেল, ট্যাসিয়ান, মাইকেল এঞ্জেলো হইব, ইহা প্রথমে আমিও ভাবিয়াছিলাম, এবং সেজন্য বহু শিক্ষকের নিকট পাঠ লইয়াছি। পরখ করিয়া দেখিয়াছি, উহা আমাদের সহ্য হইবে না।' সুধু চিত্রশিল্প কেন, অবনীন্দ্রনাথের এই কথা অন্যত্রও সমভাবে প্রযোজ্য।

এ-কথা অনস্বীকার্য-যে জাতীয় শিল্প অবনীন্দ্রনাথের তুলির স্পর্শে নবজীবন লাভ ক'রেছে। ক্ষুদ্র জলকণার ওপর সূর্যের আলোর ছোঁওয়া লাগা মাত্র যেমন রামধনু সপ্তবর্ণে

ঝিলমিলিয়ে ওঠে, অবনীন্দ্র নাথের তুলির স্পর্শে ভারতীয় শিল্পের বিক্ষিপ্ত কণাগুলি নানা রঙে তেমনি রঙীন হ'য়ে উঠেছে। ভারতীয় শিল্পের অন্তকার যে রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার রূপকার শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ। আমরা দূর থেকে তাঁর এই জয়ন্তী উৎসবের উপলক্ষে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

●

এবং সেই সঙ্গে গল্পাচার্য প্রমথ চৌধুরীকেও। অবনীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব যে-দিন অনুষ্ঠিত হয়, সেই দিনই সাহিত্যরথী প্রমথ চৌধুরীও সম্বর্ধিত হন্—অর্থাৎ গত ২০এ ভাদ্র (ইং ৬ই সেপ্টেম্বর) শনিবার দিন : রবীন্দ্র তিরোভাবের ঠিক এক মাস পরে। প্রমথ জয়ন্তী উপলক্ষে সম্বর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর গল্প ও প্রবন্ধের একটি নূতন ও চিত্তাকর্ষক সংস্করণ "গল্প সংগ্রহ" নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী গ্রন্থটি শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে উপহার দেন এবং রবীন্দ্রনাথ যে-আশীর্বাদটি গল্প-সংগ্রহের ভূমিকা হিসাবে লিখে গেছেন তা পাঠ করেন। পূরো আশীর্বাণীটি উদ্ধৃত করার লোভ হ'চ্ছে, কিন্তু স্থানাভাবে বিরত হ'লাম। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে কোষাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে এক হাজার রৌপ্যমুদ্রাপূর্ণ একখানি থালা উপহার দেন্। সভায় উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা ক'রেছিলেন, সার্ যদুনাথ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই সম্বর্ধনা উৎসবের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন উৎসবটি পরিচালনা ক'রেছেন। আমরা এ'দের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বরেণ্যকে বরণ করতে জানাটাও ক্ষমতার পরিচয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উদ্‌যাপনের জন্যে রবীন্দ্রনাথের সুপারিশ দরকার হ'লো, আমাদের পক্ষে এ ঘোরতর কলঙ্কের কথা।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, এমন লোক বঙ্গদেশে মাত্র কয়েকজন আছেন। যাতে এ পরিচিতির পরিধি বিস্তৃত হয়, তার চেষ্টা করা হ'য়েছে তাঁর গল্প-সংগ্রহ ছেপে। আশা করা অন্যায় নয়-যে এই গল্প-সংগ্রহের মারফৎ প্রমথ চৌধুরীর পাঠক সংখ্যা অন্তত জনকয়েক বৃদ্ধি পাবে। প্রমথ চৌধুরী কেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পাঠক সংখ্যাও তেমন অপর্যাপ্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ মস্ত বড় কবি—এ-কথা অবশ্য সবার মুখেই শুনে আসছি নেহাৎ বাল্যকাল থেকে। কিন্তু কেন তিনি বড় কবি এবং কিসে, এর জবাব দেওয়ার জন্যে যেটুকু ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার, তেমন লোক মাত্র কয়েকজন হয়ত আছেন। রবীন্দ্রনাথ সবার চোখে নেহাৎ এক মুঠো ধোঁয়ার মত বিরাজ করছেন—রূপকথার রাজকুমারের মত। চোখে দেখিনি, স্পর্শ পাইনি, রাজকুমারের ঐশ্বর্য দেখিনি, পক্ষীরাজ ঘোড়াটির পাখার

হাওয়া পাইনি, তবুও আমাদের স্মৃতির মধ্যে দিয়ে একটা ছায়া যেমন ঘোড়া ছুটিয়ে মেঘ ডিঙিয়ে স্বপ্নলোকে চ'লে যাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথও তেমনি আমাদের কল্পনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হ'য়ে আছেন। এমন পল্লীগ্রামে গিয়েছি, যেখানকার লোকে রবিঠাকুরের নাম শোনেনি, অথচ শরৎচন্দ্র বলতে অজ্ঞান। গৌরবের কথা নয়, অথচ এর হেতু নির্ণয় করা কঠিন। যদিও সেখানকার লোকের মুখে রবিঠাকুরের লেখা গান শোনা গেছে। সেই সময় যদি সেই পল্লীবাসীর কানে রবিঠাকুরের নামটি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, এবং তাঁর বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যায়, তখনি তাদের মনে কল্পনা ক্রিয়া আরম্ভ করবে। ফলে যে-রবীন্দ্রনাথকে তারা মনে মনে গঠন ক'রে নেবে—তা রূপকথার রাজকুমার ছাড়া আর কী?

প্রথম চৌধুরীর কথাও অনেকটা সেই ধরণের। রীববলের লেখা পড়েনি, নাম শুনেছে,—বীরবলের পক্ষ হ'য়ে ওকালতী করেছে, এমন লোকও বিরল নয়। সৌভাগ্য বলতে হবে, সেই বীরবলকে জানার এবং জানাবার একটা চেষ্টা অবশেষে হ'লো।

●

সম্বর্ধনা উৎসবের পরদিন প্রীতি সম্মিলনীতে অনেক শার্ট ও পাঞ্জাবীর সঙ্গে টাক ও টিকিরও আমদানি হ'য়েছিলো। রোগা ও মোটা সংস্করণের সাহিত্যিক, তৈলাক্ত ও রুক্ষ সাহিত্যরসিক, মুদ্রাকর ও পত্রিকা-পরিচালক ইত্যাদি সকলেই এই প্রীতি সম্মিলনীর জলযোগে অংশ গ্রহণ করলেন। কিন্তু যে-ভদ্রলোকটিকে কেন্দ্র ক'রে এই আয়োজন, মনে হ'লো, তাঁর কথা কারো মনে নেই।

এখানে কয়েকটি মনোরম দৃশ্য চোখে পড়লো এবং উপভোগ্য মনে হ'লো। জনৈক কবিযশোপ্রার্থীর জনৈক তরুণ-কবির পশ্চাদ্ধাবন, সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত হওয়ার জন্যে মুদ্রাকরের সাহিত্যিক আবহাওয়া অন্বেষণ, অজস্র ধূমোদ্গীরণ এবং ততোধিক বাকচাতুর্য। জলযোগের আয়োজন রীতিমত রসালো হওয়া সত্ত্বেও আমরা কয়েকজন একটি সঙ্কীর্ণ কোণ থেকে কক্ষের সুদূর প্রান্তের দৃশ্যাবলী দ্বারাই বেশী আকৃষ্ট হ'য়েছিলাম। কবি যশোপ্রার্থীদের রচিত কবিতা প'ড়ে অবশ্যই তরুণ-কবিটি আড়ালে হাসেন অথচ প্রকাশ্য বাহবা না দিয়ে পারেন না, সাহিত্যিকরা মুদ্রাকরটির একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাষ দিয়ে এ ওর গা টেপাটেপি করেন—অথচ বাহ্যিক কী অন্তরঙ্গতা! কী বিরাট একটি অভিনয়ের আসরে আমরা আমন্ত্রিক হ'য়েছিলাম, ভাবতে রীতিমত হৃষ্ট হ'য়ে উঠছি।

●

কবিতা এক রকমের ব্যাধি অবশ্যই, তবে এ ব্যাধিটা ঠিক টি. বি. জাতীয় নয়—একপাতে খেলেই এর জীবাণু সংক্রামিত হয় না। সত্যিকারের কবিরা যে পত্রিকায় কবিতা

লেখেন, সেখানে রামার রচনা কোনো কারণে প্রকাশিত হ'লেই সে রচনাকে কবিতা ব'লে চালু করা চলেনা ! পেট্রোল ও লোহার জন্যে সরকার বাহাদুর সংপ্রতি লাইসেন্সের ব্যবস্থা ক'রেছেন, যুদ্ধটা আরও একটু ঘোরালো হ'য়ে উঠ্‌লে হয়ত গড়াতে গড়াতে লাইসেন্স কবিতা পর্যন্ত এসে ঠেকবে। আমরা সেইদিনের আশায় ব'সে রইলাম। যতখুসি ও যা খুসি লেখা বন্ধ হওয়া দরকার। শুনতে পাচ্ছি, আমাদের এই শহরের ১৪,০০০ টন দৈনিক আবর্জনা নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হ'য়েছে। যদি কোনো শত্রুপক্ষ শহর আক্রমণ করে, তাহ'লে এই আবর্জনার যথারীতি যাতে শহরের বাইরে গিয়ে পৌঁছাতে বাধা না হয়, তার ব্যবস্থা হ'চ্ছে ! আবর্জনার পরিমাণ শুনে হতবাক্ হ'য়েছি। জান্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে, এর মধ্যে সাহিত্যিক দানের ওজন কতটা। দুইভাবে আবর্জনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে : (১) যে আবর্জনা সৃষ্টি করবে, তা'কে দিয়ে গলাধঃকরণ করিয়ে, (২) আবর্জনার স্রষ্টাদের শহর থেকে বে-শহরে পাঠিয়ে। সরকার বাহাদুর কোন পথটি নেবেন তা অবশ্য বলা কষ্ট।

অবশ্য, সুধু আবর্জনা নিয়ে মাথা ঘামালেই কাজ শেষ হ'লোনা। তা'তে মাথার মধ্যে আবর্জনা বাড়বে, আর বাইরে ঘর্ম দেখা দেবে। কর্ম চাই। তবে, দেখতে হবে—কর্মটি অপ-দ্বারা যেন কলুষিত না হয়। অপ্ হোক,—এই আমরা চাই। জলসরবরাহের কথা বলছি। অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি বিশেষ হ'চ্ছে না—মোড়ে মোড়ে টিউবওয়েল বসিয়ে তার হাতলটিও খুলে নেওয়া হ'চ্ছে। তা তো হ'লো, কিন্তু শহর আক্রান্ত হ'লে আমরা কোথায় যাবো ? গড়ের মাঠে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে-সব গর্ত খোঁড়া হ'য়েছে, সেখানে এখন চতুষ্পদেরা প্রচুর ঘাস খাচ্ছে : আমাদের খাবি খাওয়ার জায়গা সেখানে হবে ব'লে মনে হয়না। এ-বিষয় আমরা ফজলুল হকের পরামর্শ নিতে পারতাম কিন্তু অধুনা তিনি বড় বিপন্ন অবস্থায় আছেন। কালো নিশানের কথা শুনে তাঁর নিশানা হারিয়ে গেছে। লক্ষ্যভ্রষ্টের ভয়ে তিনি নিজেই ভীত, এ-সময় আমাদের তাঁকে অধিক বিপন্ন করা সাজেনা।

●

আমরা কিন্তু চমৎকার যুগের মানুষ। ভাবতে বড় আরাম পাচ্ছি-যে কতগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের চোখের সামনে আর চারপাশে ঘটছে। আমরা এর গুরুত্ব ততটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিনে বটে, কিন্তু যে বিরাট মনুষ্যসমাজ আমাদের অনেক দূর ভবিষ্যতে আজ ব'সে আছে, তারা পৃথিবীতে পদার্পণ ক'রে আমাদের নিশ্চয়ি ঈর্ষার চোখে দেখবে। তারা ঈর্ষার চোখে দেখবে ভেবে বেশ গৌরব বোধ করছি বটে—কিন্তু সেই গৌরবের বাজনা বাজছে হাড়ে হাড়ে। ক্রমাগত জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। চাল্, ডাল, তরিতরকারী থেকে আরম্ভ ক'রে কাপড়, জামা, সিগারেট, ব্লেড সব। আজ শুনলাম, কয়লায়ও নাকি হাত দেওয়া যাবেনা—আগুন ! এখন বাকি আছে হাওয়া।—দাম এখনো বাড়েনি, তবে কারা নাকি এন্তার গ্যাস বোমা ছেড়ে হাওয়া খাওয়া বন্ধ ক'রে দেবে। পূজার বাজারে তাই ভাবছি, গ্যাস-মুখোসের দাম কত ?

বোমা না বৌমা

শ্রীবিভাসকুমার দত্ত রচিত
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বল খচিত

"কলকাতায় বোমা পড়বে নিশ্চয়ই।" এ ধারণা শুধু আমার একার নয়, অনেকেরই মনের ঈশান কোণে আজকাল কাল মেঘের মত এই ধারণা জমাট বেঁধে উঠেছে। ধারণাটা বদ্ধমূল হ'ল সেদিন মাণিকতলার মোড়ে সরকারের সহৃদয় প্রচার বিভাগের সময়োচিত সতর্কীকরণে। "ভাঙা-গড়ার বিপুল ধরায়" এক নিমিষে কি যেন সব ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এই রকমের একটা গানে প্রাণটা পূর্ব্বেই ভাজনের ভয়ে ভারী হয়ে উঠেছিল, তারপরে যখন লাউডস্পিকার সহযোগে বক্তা সুরু করলেন "……যুদ্ধ আপনার বাড়ীর কাছে এগিয়ে এসেছে, আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে নাৎসী বর্ব্বরতার কালিমায় শুধু যে ইউরোপের নিষ্কলুষ সভ্যতাই কলঙ্কিত হবে তা নয়, ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও চিরতরে ম্লান হয়ে যাবে……" প্রভৃতি, তখন অপ্রিয় হলেও কথাগুলির সত্যতা অস্বীকার করার যো রইল না। যাই হোক মান ত অনেকদিন গেছে, বিমান আক্রমণ হলে কি করে অন্ততঃ পৈতৃক প্রাণটুকু রক্ষা করা যায় সেই সম্বন্ধে সরকারী উপদেশগুলি মনোযোগ সহকারে শুনে ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

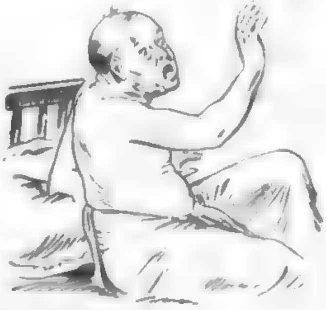

রাত্রি ঠিক কত হয়েছিল বলতে পারি না, কারণ আমি তখন ছিলাম গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ ঘুম ভাঙল প্রচণ্ড এক শব্দে। দাদু খাটের উপর কাৎ হয়ে চীৎকার করছিলেন—"বোমা, বোমা, বাতি-নিভাও, বাতি নেভাও, ব্ল্যাক-আউট, ব্ল্যাক-আউট।" বাতি নিভলো কি জ্বলল বুঝতে পারলুম না, কারণ আমার চোখে তখন অন্ধকার। শুনলাম শুধু বাড়ীসুদ্ধ লোকের ছুটাছুটি, চীৎকার ও গোঙা

সরু কণ্ঠের মিশ্রিত আর্ত্তনাদ। দাদু আরও জোরে চীৎকার করে উঠলেন—"লুট হচ্ছে, লুট হচ্ছে, এ, আর, পি—এ, আর, পি, ওয়ার্ডেন, ওয়ার্ডেন……" আমার যেন হঠাৎ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল. প্রাণপণ চেষ্টায় রুদ্ধ-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলাম, "গ্যাস ছাড়ছে, গ্যাস ছাড়ছে, গ্যাসমাস্ক, গ্যাসমাস্ক……" মুখোসের পরিবর্ত্তে মুখ খসে পড়ার যোগাড় হল বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চড়ে। চেয়ে দেখি আলো জ্বলছে। আমার বিছানার এক পাশে বড়মামী পড়ে গোঙ্গাচ্ছে। বোধ হয় ছোট মামাই তাঁকে কোলপাঁজা করে এঘরে এনেছিলেন। ছোটমামা ডাক্তার, অল্পক্ষণের মধ্যেই তার চেষ্টায় শুধু যে বড়মামীর জ্ঞান সঞ্চার হ'ল তা' নয়, তার শক্তিমান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আমরাও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলাম, যদিও তখনও আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করে কাঁপছিল। তখন বোঝা গেল বিবাহের ছয় বৎসরের মধ্যে একাদিক্রমে মা-ষষ্ঠীর কৃপায় ষষ্ঠ সন্তানের মাতা হয়ে, বড় মামীর পতন ঘটেছিল নিদারুণ দুর্ব্বলতার জন্য। অবশ্য পড়ে গিয়ে প্রথমতঃ তার উত্থানশক্তি লোপ পেয়েছিল, আর জ্ঞান লোপ পেয়েছিল আমাদের চীৎকারে। তাই ছোটমামা উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন, "কতবার বলছি বাবা, সন্তান প্রসবের পর বৌদিকে "ল্যাডকোভাইন" খাওয়াতে, তা ত' আপনারা শুনবেন না"। দাদু লজ্জিতভাবে বললেন, "আমরা গরীব গেরস্থ লোক, পোর্ট ওয়াইন দেওয়া দামী টনিক খাওয়াবার পয়সা পাব কোথায়?" ছোটমামা বললেন, "সে কথা আগে বললেও ত' পারতেন। ল্যাডকো ত' সেই জন্যই "বলীয়ান" বলে আর একটি দামী টনিক বাজারে দিয়েছে। তেজস্কর দেশী গাছগাছড়া থেকে উৎকৃষ্ট সুরাসার যোগে তৈরী বলে "বলীয়ানের" দামও কম অথচ তার উপকারিতা কোন অংশে কম নয়।"

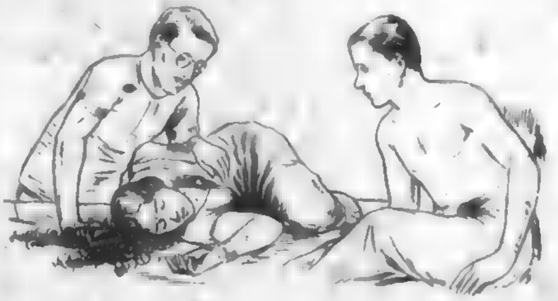

এমন সময় পাশের বাড়ীর সর্ব্বজনীন খুড়ো চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি ভায়া, কতবড় বোমা পড়ল, পুব দিকটা দেখছি একেবারে পুকুর হয়ে গেছে।" ছোটমামা চীৎকার করে বললেন "খুড়ো পুকুর করেছে চাঁদের আলো আর তোমার আফিংএর নেশায় মিলে। বোমা পড়েনি, পড়েছেন তোমাদের বৌমা। ভয় নেই, ঘুমোওগে যাও খুড়ো। যে দেশে খুব শক্তির একটি নিদর্শন হচ্ছে আমার এই সাধের ভাগ্নেটি সে দেশে বোমা ফেলার অপব্যয় কোন বুদ্ধিমান জাতই করবে না।"……না সে অপমান সহ্য করতে পারি নি। সেইদিন থেকেই প্রত্যহ নিয়মিত "বলীয়ান" খাচ্ছি। ফলে বোমা যদি আজ সত্যই পড়ে তবে বোমার আঘাতে মরতে পারি কিন্তু বোমার ভয়ে মরব না।

নাচঘর

সুশীল রায়, সম্পাদক

গোপাল ভৌমিক, সহঃ-সম্পাদক

ধীরেন ঘোষ, পরিচালক

ত্রয়োদশ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৪৮ { অষ্টম সংখ্যা

নিয়মাবলী

১। বর্ত্তমান সংখ্যা নাচঘরের ৮ম সংখ্যা।

২। প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নাচঘর প্রকাশিত হয়।

৩। প্রতি সংখ্যার নগদ দাম চার আনা, বার্ষিক সডাক তিন টাকা চার আনা :

৪। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ এবং মৌলিক ও অনুবাদ গল্প, উপন্যাস একাঙ্ক-নাটক কবিতা প্রভৃতি রচনা নাচঘরে সাগ্রহে গৃহীত হয় :

৫। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়;

৬। রচনাদি সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	প্রতি বারে	৩০৲
,, অর্দ্ধ ,,	,, ,,	১৬৲
,, সিকি ,,	,, ,,	৯৲

কভার বিশেষ স্থান ও রঙীন বিজ্ঞাপনের জন্ত পত্র লিখে জানুন।

ভারতের বিভিন্ন অংশে নাচঘর বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক।

পরিচালক, নাচঘর

কার্য্যালয় :

৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন : কলিকাতা ৩১৪৫

টেলিগ্রাম : রিদম্‌স্ (Rhythms)

সূচীপত্র

লেখ-সূচী

রচনা	লেখক	
১। সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র (রবীন্দ্রালোচনা)	'বনবাসী'	৪৯৫
২। হাস্যরসিক বীরবল (প্রবন্ধ)	গৌর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৯৯
৩। বিদ্যুৎ চমক (একাঙ্ক নাটক)	মন্মথকুমার চৌধুরী	৫০৪
৪। আবেদন (কবিতা)	মহ্‌বুবুর রহমন খাঁ	৫১৮
৫। প্রাকৃতিক (উপন্যাস)	সরোজকুমার মজুমদার	৫১৯
৬। হাবামাহন্ (গল্প)	কণাদ গুপ্ত	৫২৪
৭। কলাবহন	লীলাময় বসু	৫২৯
৮। গুরুদেব (শ্রদ্ধাঞ্জলি)	রেবা রায়	৫৩২
৯। আমার জীবন (অনুবাদ উপন্যাস)	গোপাল ভৌমিক	৫৩৫
১০। গৃহকোণ	রেণু দেবী	৫৪৬
১১। পরিচয়		৫৪৯
গ্রন্থ :	সুশীল রায়, গোপাল ভৌমিক	
চিত্র :	অ. ভ.	
রঙ্গ :	অনিল ভট্টাচার্য	
নৃত্য :	শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু সেন	
১২। সম্পাদকীয়		৫৫৭

চিত্র-সূচী

১। অঙ্কন (আলফ্রেড ইভেন্স অঙ্কিত) ৫১০

তৃপ্ত!

শারীরিক বা মানসিক, যে-কোনো রকম একটানা পরিশ্রমের পর শরীর আবার তাজা করে' তুল্‌তে হলে চাই এক পেয়ালা চা। চা নুয়ে-পড়া কর্ম্মশক্তিকেও জাগ্রত করে' তোলে। শীতে কি গ্রীষ্মে একমাত্র চা-ই আপনাকে সত্যিকারের আরাম আর সুখের অনুভূতি এনে দেয়।

চা প্রস্তুত-প্রণালী : টাট্‌কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশি দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের উপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজ্‌তে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

ভারতীয় চা

সার্বজনিক পানীয়

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 148 V

সুর্য চন্দ্র নক্ষত্র

(রবীন্দ্রালোচনা)

'বনবাসী'

[লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি এখানে যা লিখেছেন তা আংশিক নয়, পূরো সত্য। এ-ক্ষেত্রে স্বনামে তিনি প্রচারিত না হ'য়ে 'বনবাসী' নামের অন্তরালে আচ্ছাদিত থাকার পক্ষপাতী। নাচঘর সম্পাদক।]

একটা লেখা পড়িলাম—'রবি অস্তে গেলে আকাশে চাঁদ উঠে দুচারটা তারা থাকে—। কিন্তু আমাদের আকাশে একটা তারাও নাই,—দুচারটা ফানুষ হয়ত আছে।' কথাটি সত্য কি ? যিনি মহৎ—চিরদিন তিনি সকলের অনন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। তাই বলিয়া অন্য দিকে না চাহিব কেন ? কবি কালিদাস রায়, কুমুদ মল্লিক দুঃখীর কবি, যাঁহাদের সুমিষ্ট কবিতার সুর অন্তরে অন্তরে বহিতেছে, গরীবের দুঃখ, দুঃখীর বেদনা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ইহারাই শুনাইয়াছেন। তাঁহাদের সুর ব্যথা ভরা,- ভাষা বেদনার,—ঝঙ্কার করুণ। সে সব অমূল্য কবিতা কিছু কিছু সকলেরই কণ্ঠস্থ।—তেমনি করুণা নিধান, যতীন বাগচী, মোহিত মজুমদার, জসীম উদ্দীন, ইহাদের দানে বঙ্গভারতী ঐশ্বর্য্যশালিনী। রবীন্দ্রনাথ জননীকে সাজাইয়াছেন রত্ন ভূষায়, ইহারা ভূষিত করিয়াছেন পুষ্প সজ্জায়—সে ফুল ঝরিয়া পড়িবার নয়—অমর কুসুম। এবং সে কুসুম-ভূষায় বঙ্গভারতী গৌরবময়ী। কবি নজরুল ইসলাম অগ্নিবীণায় একদিন বজ্র রাগিণী বাজাইয়াছিলেন, সে হুঙ্কার সচকিত করিয়াছিল বাংলাকে। ইহাদিগের দান সামান্য নয়, ইহারা ফানুষ নহেন উজ্জ্বল নক্ষত্র,- জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র। যাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে বঙ্গের কাব্যাকাশ এখনো উজ্জ্বল।

আরো অনেক কবি আছেন, নীরবে বঙ্গ মাতার সেবায় মগ্ন,—মাঝে মাঝে তাঁদের পুষ্পাঞ্জলি চোখে পড়ে। যশঃ মান কিম্বা অর্থের প্রয়াসী নন তাঁরা,- নিভৃতে নিজ সাধনায় নিবিষ্ট। রবি অস্ত যায়- শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতির বিদ্যমানতা স্বীকার কেননা করিব। চন্দ্রবিহীন নিশার অন্ধকার কি অগণিত উজ্জ্বল নক্ষত্রের কিরণে কিঞ্চিৎ দূর হয় না ? আমাদের আকাশ এখনো অন্ধকার নয়, সূর্য্য নাই—চন্দ্র নাই, কিন্তু দীপ্তিশালী নক্ষত্র রহিয়াছে।

শেষের দিকে বোধ হয় কাব্যপ্রতিভা নিস্তেজ হইয়া আসে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনার মত তাঁর শেষের রচনা প্রখর নয়। চিত্রাঙ্গদা নৌকাডুবির কাছে দাঁড়াইতে

পারে এমন রচনা পরবর্ত্তী জীবনের নয়। তাঁর অতুলন কাব্য গ্রন্থাবলীর মত কি গদ্য কবিতা সমূহ? কয়টি গদ্যকবিতা কয়জনের স্মরণে আছে? সেগুলি যেন মেঘের মত উঠিয়া মিলাইয়া গেল। 'সত্য মঙ্গল ধ্রুব জ্যোতি তুমি'—'তোমার রাগিণী জীবন কুঞ্জে'—'সংসার যবে মন কেড়ে লয়'—'জীবন যখন শুকায়ে যায়'—এই সব গানের সম আসনে দাঁড়াইতে পারে কি তাঁর শেষের রচিত একটিও গান? ভাষার অভাব সুরে অনেকটা পূরণ হইতে পারে—কিন্তু সে প্রকৃত সৃষ্টি নয়।

বঙ্কিম ও রবীন্দ্র শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক, শ্রেষ্ঠ কবি। বঙ্কিম শক্তিমন্ত্রের সাধক,—রচনা তাঁর শক্তি প্রধান। রবীন্দ্র প্রেম উপাসক—রচনা প্রেম প্রধান। কিন্তু একটি মহাকাব্য বা একটি বিরাট উপন্যাস তার মধ্যে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ সীতারাম প্রতাপের ন্যায় অমর চরিত্র রবীন্দ্রসৃষ্টিতে নাই। সত্যানন্দের মত মহা সাধক, ভবানন্দ জীবানন্দের মত আত্মোৎসর্গকারী সাধকও নাই। ভ্রান্ত নিরুৎসাহ দুর্ব্বল জাতিকে জাগাইয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে,—তেমন মহাবীর বঙ্কিমের পর আর আসে নাই। সে বজ্র নির্ঘোষ আর শুনিতে পাই নাই,—এক নিমেষে সীতারামের মত গর্জ্জিয়া—প্রতাপের মত উন্মত্ত বেগে জ্বলন্ত রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে—ভবানন্দের মত শত শত্রুর সম্মুখে ছিন্ন বাহু লইয়া যুদ্ধ করে—রাজসিংহের মত সমস্ত দেশকে কম্পমান করে,—সে মহা যোদ্ধাগণ অন্তর্হিত—বঙ্কিমের সঙ্গে বাংলা হইতে শক্তিমন্ত্র অন্তর্হিত। আছে প্রেম—উহাই সম্বল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বা উপন্যাস-সৃষ্ট চরিত্রগুলি অন্তরে স্থায়ী আসন রাখিতে পারে নাই। নায়কগণ নায়িকার অনুবর্ত্তিনী। গোরার মত তেজস্বী ছেলেও সুচরিতার মত এক নাবালিকার হাত ধরিয়া চলে। সমগ্র রবীন্দ্ররচনার মূল বস্তু প্রেম। বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্র সেকালের অজেয় ক্ষত্রিয় বীরকুলকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রবীন্দ্ররচনায় পাই একালের ভাব ও ভ্রম প্রধান রূপ। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, তাঁহার অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার জন্য। সঙ্গীতে কাব্যে উপাখ্যানে সমগ্র রচনাবলী তাঁহার বিরাট। দেশবাসী তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই, তাঁহার প্রতিভার আদর করে নাই—এ কথা সত্য নহে। অসীম যশঃ-ভাগ্য তাঁহার—দেশবাসী সাধ্যাতিরিক্ত শ্রদ্ধা, আদর ও সম্মান দিয়াছে তাঁহাকে, কালিদাস মাইকেল বঙ্কিম—তিন দিক্‌পাল কি রবীন্দ্রনাথের অর্দ্ধেক জয় গৌরবও লাভ করিয়াছিলেন?

আজ রবীন্দ্রনাথ পার্থিব সুখ দুঃখের, নিন্দা সুখ্যাতির অতীত। সংসারে ছিলেন তিনি মহা ভাগ্যবান—সব দিকে শ্রেষ্ঠ ধনে, মানে, রূপে, বিদ্যায়। কিন্তু মহা সুখী ছিলেন কি?

যিনি যত বড় তাঁর তত যন্ত্রণা। স্তাবকবৃন্দের ভক্তি স্তুতি দেখা সাক্ষাৎ নিবেদন

আবেদনের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল তাঁর সারা জীবন। নিশ্চিন্ত শান্তি হয়তো ঘটে নাই তাঁর
ভাগ্যে। সাধারণতঃ পঞ্চাশের পর হইতে মন হয় শান্তিপ্রয়াসী অন্তর্মুখী। কিন্তু সে অবসর
সে সুযোগ তাঁর ছিল না। তবু তিনি কত শক্তিমান, এই আবেষ্টনের মধ্যে অফুরন্ত সুধার
উৎস লেখনী মুখে চালিয়াছিলেন। সাধারণের সঙ্গে পার্থক্য তাঁহার এইখানে। নিশিদিন
যদি ভক্ত শিষ্যদল ঘিরিয়া থাকে, একবিন্দু অবসর না মেলে, অন্তত নিজেকে অনুভব করিবার
মত একটু অবকাশ—তবে ঠিক থাকিতে পারে কয় জনে? কিন্তু তিনি ছিলেন অবিচলিত।
সুখ বা দুঃখ—কোনটির প্রভাব তাঁর উপর বেশী আধিপত্য করিল সে খবর কে
রাখিয়াছে? তিনি কি বলিয়া গিয়াছেন কিছু—কোনদিন কিছু আভাস দিয়াছিলেন কি?

রুগ্ন দুর্ব্বল দেহে একটু নির্জ্জনতা ছিল না তাঁর—যে মুহূর্ত্তে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ
শেষ হইতেছে—সেই পরম মুহূর্ত্তে তাঁর গৃহদ্বারে অধীর জনতার উন্মত্ত উচ্ছ্বাস। কণ্ঠ চিরতরে
নীরব—কিন্তু যাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের তুলনা ছিল না,—সে জ্ঞান নিশ্চয় ছিল অন্তরে অন্তরে
ছিল শ্রবণ শক্তি, ছিল অনুভব শক্তি, কি চিন্তা তখন ছিল তাঁর মনে, কি ভাবিয়াছিলেন?
তুমুল গোলমাল কি সেই পলায়মান প্রাণপাখীটিকে ব্যতিব্যস্ত করে নাই আরো অস্থির
করিয়া দেয় নাই? এই কি শ্রদ্ধা ভক্তির নিদর্শন? ইহার জন্য দায়ী তাঁর অদৃষ্ট! অন্য
কাহাকেও দোষ দিবার নাই। কারণ একের ইচ্ছায় এসব হয় নাই—ইহা সমষ্টিগত।

মনে করি, তিনি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। তবু জানিতে ইচ্ছা হয় কি
অবস্থায় আছেন এখন। স্বর্গগত পিতা মাতা স্ত্রী সন্তানের সঙ্গে কি দেখা হইল!—কবি
সত্যেন্দ্রনাথের জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন—'সেথা তুমি অগ্রজ আমার'—দেখা হইয়াছে কি
তাঁর সঙ্গে? কত রচনা হয়তো অসমাপ্ত ফেলিয়া গিয়াছেন—কত গৌরবোজ্জ্বল উপাধি,—পৃথিবী-
ব্যাপী শ্রদ্ধা সম্মানের আসন। কিন্তু মনে কি পড়ে আর? যখন বাক্‌শক্তি শেষ হইয়া
গেল, জন্মের মত পৃথিবী ছাড়িয়া চলিলেন—চারিপাশের আত্মীয় ও শুশ্রূষাকারীদের তখন
আর সাধ্য নাই সে অশান্ত আত্মাকে সান্ত্বনা দিতে—সেই মুহূর্ত্তে কোন্ অভয় কোন সান্ত্বনা
লাভ করিয়াছিলেন?—শত প্রশ্ন উঠিতেছে কিন্তু সমাধান করিবার শক্তি নাই।

একটা কথা মনে পড়ে—জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের নানাভাবের প্রতিচ্ছবি
ও প্রতিকৃতির পূজা হইয়াছিল! একটা প্রতিচিত্র দেখিয়াছিলাম তাহার সঙ্গে বেষ্টন করিয়া
এক জ্যোতির্মণ্ডল; উহা মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা। জীবিত ব্যক্তির ছবিতে ফুলের মালা
দেওয়াও কুসংস্কার। সংস্কার কু হোক, সু হোক দেশের। রবীন্দ্রনাথও দেশের।
রবীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু না হোক, কিন্তু আর পাঁচ দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে
অসম্ভব ছিল না।

সেইজন্য ভাবি এখন যাঁরা কাব্য গগনচারী—তাঁরা পিক নন—জোনাকী নন—উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। হয়তো এখন দানশক্তি কমিয়া আসিয়াছে,—কিন্তু দিয়াছেন যা, তার তুলনা কই ? তাঁরাই তো এখন বঙ্গমাতার সম্বল। দানশক্তি চির দিন সমান থাকে কি ? রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সেও সৃষ্টির উৎস মুখ বন্ধ হয় নাই—কিন্তু উচ্ছলিত নির্ম্মল জল প্রবাহ আর ছিল না ; যা ছিল, না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। দিবার যা—পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ দিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়িয়া সভা ও সমিতি, গান ও বক্তৃতা বিরাম নাই বিচ্ছেদ নাই - অবিরাম। তাঁহার রচনাবলী চিরস্থায়ী করিতে, উপহার দিতে, ঘরে ঘরে রাখিতে কত শত প্রস্তাব অহরহ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঠিতেছে ও মিলাইতেছে। দেশব্যাপী যেন একটা প্রতিযোগিতা। এরূপে কি স্মৃতি চিরকাল সঞ্জীবিত রাখা সম্ভব ? অবসাদ ও ক্লান্তি আসিলে এ সব স্থায়ী হয় না, অন্ততঃ দেশবাসী কিছুক্ষণ নীরবে তাঁহার কল্যাণ কামনা করুক—নীরবে অনুভব করুক তাঁহাকে। তাঁহার রচনার জন্য এখানে এত প্রচেষ্টার দরকার বোধহয় নাই। তিনি যদি সত্য মঙ্গল পদার্থ দিয়া থাকেন দেশকে—আপনি সে জ্বলিবে হীরার মত। তেল সলিতা দিয়া জ্বালাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। কালিদাস, মাইকেল বা বঙ্কিমের জীবনকালে এত জয়ন্তী উৎসব—এত সভা সমিতি উৎসব বক্তৃতা, এত আন্দোলন হয় নাই—কিন্তু তাঁদের স্মৃতি ধ্রুব নক্ষত্রের মত, কীর্ত্তি তাঁদের অমর, লোক চিত্তে আসন তাঁদের চির প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা চির স্মরণীয় হইয়া আছেন। সত্য অবিনশ্বর।

সেইজন্য মনে হয় অন্ততঃ কিছুদিন নীরব থাকা ভাল। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কয়েকটা যুগ ধরিয়া সাময়িক পত্রিকাগুলি চলিতেছে। ফুটন্ত পদ্ম, গোলাপ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া দেখার মত রবীন্দ্রকাব্যের লাইনের পর লাইনগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছে। এবং সেই কাব্যাংশের ছন্দ ও সুর লইয়া যুগ বর্ষ মাস ব্যাপী যুদ্ধ। কিন্তু সান্ত্বনাহীন মর্ম্মান্তিক দুঃখ যে, এহেন পিতামহতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় কবিকেও শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ফেলিতে দেওয়া হয় নাই। সেই মুহূর্ত্তে একটাও প্রস্তাব উঠে নাই—সেই উন্মত্ততা নিবারণ করিতে। পথ প্রদর্শকরূপে কেহ আসেন নাই সেই অশান্ত মুহূর্ত্তে। কবির অবস্থা অজ্ঞাত ছিল না কলিকাতাবাসীর। অন্ততঃ আত্মীয় ও অন্তরঙ্গের। তাঁহার চির বিদায়ক্ষণে কোন শ্রদ্ধা ভক্তি আত্মীয়তা কাজে লাগিল না, সমস্ত উচ্ছ্বাস বরফবৎ জমাট বাঁধিয়া গেল। এখন কবিতার ঢেউ পৃথিবী ভাসাইয়া দিক—দিকে দিকে শোকগীতি শোকসভায় উচ্ছ্বাস উঠুক।—রবীন্দ্রনাথের কি ? তিনি সকলের অর্ঘ্য ও পুষ্পাঞ্জলির হাত এড়াইয়া নিশ্চিন্ত শান্তিলাভ করিয়াছেন।

হাস্যরসিক বীরবল

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আকবর যেমন সবচেয়ে বেশী খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছিলেন আকবরের রাজত্ব কালে তেমনি খ্যাতনামা হয়েছিলেন হাস্যরসিক বারবল। আকবর শিল্প ও সাহিত্য ছাড়াও বিভিন্ন সুকুমার কলার দিকে নিজে আকৃষ্ট ছিলেন বলেই সাহিত্যকারগণ তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা পেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। প্রতিভার সমাদর আকবরের চরিত্রের একটা বিশিষ্ট গুণ। ইতিহাসে লিখেছে, তিনি বহু দূর দেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ প্রতিভাকে নিজে আহ্বান জানিয়ে—স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল, ফৈজী কবি, সুগায়ক তানসেন, রাজস্ব সচীব তোডরমল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মানসিংহকে আমরা যতটা মনে রেখেছি এবং সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে তাঁদের যতটা প্রাধান্য দিয়েছে হাস্যশিল্পী বীরবল তার কণামাত্রও পাননি। ইতিহাসে যাঁকে সাধারণভাবে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আজ তাঁরই কথা শোনাচ্ছি।

গোদাবরীতীরে অবস্থিত মর্জাল ব'লে এক ক্ষুদ্র গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে বীরবলের জন্ম হয়। ছোটবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিলো ব্রাহ্মদাস। কিন্তু তাঁর শৈশবকাল কেটেছিলো ঘোরতর দুঃখ আর বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে। মাত্র চার বৎসর বয়ক্রমকালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ঠিক এই সময় তাঁর একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসিকান্নায় ভরা এই সংসার আর ছোট ভাইটিকে পশ্চাতে ফেলে রেখে সন্ন্যাসগ্রহণের প্রেরণায় দেশত্যাগী হন। চার বছরের শিশু—সে সম্পূর্ণভাবে আত্মীয় স্বজনের কৃপা ও করুণার পাত্র হ'য়ে রইলো। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই, যে শিশুর জীবন প্রভাত হ'ল দুঃখ দৈন্যের মাঝে, বিঘ্ন সঙ্কুল ছন্নছাড়া অবস্থায় যার জীবন হল সুরু, অবহেলা আর অবজ্ঞার কোলে যে হল মানুষ তার পরবর্ত্তী জীবনে সে এই হাস্যের ভাণ্ডার পেলো কোথা থেকে। শত বিক্ষোভ ও দৈন্যের পাথরে তাঁর স্বাভাবিক হাস্যরসের প্রস্রবনের ধারাকে বিন্দুমাত্রও ব্যাহত করতে পারেনি।

দুঃখ দিয়ে জীবনের প্রারম্ভ হ'লেও ভাগ্যদেবী তাঁর ওপর সুপ্রসন্ন ছিলেন। তের চোদ্দ বছরের ছেলে ব্রাহ্মদাসের পালনের সমস্ত ভার নিলেন কলিঞ্জরের প্রধান পণ্ডিত মশায়। এইভাবে মানুষ ক'রে তিনি বীরবলের সঙ্গে নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিলেন। এই বিবাহের কিছুকাল পরেই পণ্ডিত ইহলোক ত্যাগ করলেন আর তাঁর সুবিশাল সম্পত্তির একমাত্র মালিক হলেন বীরবল। তাছাড়া কলিঞ্জরের প্রধান পণ্ডিতের পদটাও উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়ে গেলেন।

তারপরের কিছু দিন আর আমরা ইতিহাসে বীরবলের সাক্ষাৎ পাইনা। আকবরের রাজত্বে পারিষদ পদে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই। তাঁর এই সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া নিয়ে ঐতিহাসিকের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। কেউ বলেন, বীরবলের এই আমুদে স্বভাব আর চতুর রঙ্ তামাসা করবার ক্ষমতার কথা কলিঞ্জর পেরিয়ে দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর আকবরও ঠিক সেই সময় 'মস্কারা' অর্থাৎ ঠাট্টা তামাসা করবার একজন লোক খুঁজছিলেন। আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট্ আদর ক'রে ধ'রে নিয়ে এলেন বীরবলকে তাঁর রাজধানীতে। তাঁর রাজত্বকালেই প্রসিদ্ধ ইতিহাস রচয়িতা বদায়ূনী এক আকবর-নামা রচনা করেন। সেখানে তিনি বলেছেন,—একদিন সম্রাট্ এই দুঃস্থ ব্রাহ্মণকে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষে করতে দেখলেন। তাঁর মিষ্টি গলা আর সুচতুর রচনাভঙ্গীতে মুগ্ধ হ'য়ে সম্রাট্ তাঁকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন। আর একজন এই কাহিনীর সুন্দর একটী চিত্র এঁকেছেন।

একবার এক পরিচারক সম্রাট্‌কে পান সেজে এনে দেয়—অতিরিক্ত চূণ দিয়ে। কাজেই তাঁর জিব গেল পুড়ে এবং তিনি তার উপর অতি মাত্রায় রুষ্ট হ'য়ে উঠলেন। অমনি তাকে আদেশ দেওয়া হল, সে যেন অনতিবিলম্বে বাজার থেকে বেশী পরিমাণ শক্ত শুকনো চূণ নিয়ে আসে। পরিচারক চলে গেল।

ভাগ্যক্রমে বাজারে বীরবলের সঙ্গে দেখা। বীরবলের কৌতূহলটা স্বভাবতঃই ছিল সাধারণের ওপরে। তিনি এত চূণ কেনার কারণ জিগেস্ করলেন তাকে। কারণ শুনে বীরবল লোকটাকে সাবধান ক'রে দিলেন যে সম্রাট্ নিশ্চয়ই ঐ চূণ তাকে ভক্ষণ করতে বলবেন। কাজেই সে যেন ঠিক সম পরিমাণ ঘি কেনে আর চূণটা খাওয়ার পর সব ঘি টুকু খেয়ে ফেলে।

বীরবলের কথাই খেটে গেল। এবং তাঁরই উপদেশের গুণে লোকটা সে যাত্রা সম্রাটের রোষের আগুন থেকেও রেহাই পেলো। সম্রাট্ তার এই সুচতুর পরামর্শদাতাটীর নাম জানতে চাইলেন। শুধু জানতে চাওয়া নয়, এও তিনি জানালেন যে তাঁরও ঠিক

এমনি একজন লোকের প্রয়োজন এবং তিনি সেইদিনই তখনি তাকে নিজের কাজে বহাল করবেন।

যাই হোক্ কেমন ক'রে যে বীরবল মোগলরাজ সভায় প্রবেশ করলেন, কেমন করেই বা তীক্ষ্ণ ও প্রখর মেধাশক্তির জোরে দেশজোড়া নাম কিনলেন সে রহস্যের আজও সঠিক কোনো মীমাংসা সম্ভবপর হয়নি। তবে জীবনে তিনি সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন এটা অবিসংবাদিত সত্য। আর এতে আশ্চর্য্য হবারও কিছু নেই। মানুষের মন ও চরিত্রের আনাচ কানাচের খবরটুকু পর্য্যন্ত তাঁর জানা ছিল; কৌতুক, রঙ্গ ব্যঙ্গ ঠাট্টাবিদ্রূপের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। ঠিক কোন্ সময় কি হাবভাবে কোন্ কথাটা বললে সবাই প্রচুর আনন্দ উপভোগ করবে অথচ মনে মনে সেই কথাটার অন্তর্নিহিত সত্যটাকে উপলব্ধি না ক'রে পারবে না এই খবরগুলি তাঁর বিশেষভাবেই জানা ছিল। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল অদ্বিতীয়। কোন লোক কোন দিন তাঁকে বিদ্রূপে অপ্রতিভ করতে পারেনি, রাজসভার আনন্দ ও পরিহাসের খোরাক যোগাবার যে ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল তা' হাসিমুখে, বিদ্যা ও বুদ্ধির চাতুর্য্যে বহন করবার উপযুক্ত যোগ্যতা তাঁর ছিল। কথা ও হাস্যপূর্ণ উক্তিতে হারবার লোক ছিলেন না তিনি।

ধূমকেতুর মত এসে উদিত হলেন বীরবল। সম্রাটের হৃদয় জয় করতেও তাঁর দেরী হল না। সম্রাট্ আকবরের অন্যান্য অসংখ্য পার্ষদ ছিল কিন্তু বীরবল ছিলেন সকলের চেয়ে প্রিয়। শুধু প্রিয় নয় আকবরের মনের প্রতি খবর, রাজ্যসংক্রান্ত প্রতিটা গোপন সংবাদ শুধু সম্রাট শুধু বীরবলেরই গোচর করতেন, হাস্যমুখে বিনা দ্বিধায় মনোযোগ সহকারে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। রাজ্যের কোথায় কি বিশৃঙ্খলা জেগে উঠেছে, কি উপায়ে চিরস্থায়ী শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারা যাবে প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা চলত দুজনের মধ্যে। অথচ বীরবল রাজনীতিক ছিলেন না, ইতিহাসও তাঁকে রাজনীতি থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। তবু আকবরের রাজকার্য্যে যদি কেউ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহায়ক ছিলেন ত সে বীরবল, আকবরের বিপদে দুশ্চিন্তার যদি কেউ শান্তি ও সান্ত্বনা, উপদেশ ও কর্ত্তব্যের বাণী শোনাতেন ত সে বীরবলই। বাস্তবিকই বীরবল যতটা প্রশ্রয় ও স্বাধীনতা সম্রাটের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা' সমসাময়িক আর কারও বরাতে বড় জোটেনি। মানসিক বিপর্য্যয় ও অসুস্থচিত্ততার সময় আকবরের শয়ন কক্ষে প্রবেশের দুর্লভ অনুমতিও দেওয়া ছিল তাঁকে। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট্ বীরবলের মধ্যে দুঃখ ঝঞ্ঝায় আশ্রয় খুঁজে পেতেন, তাঁর স্থির নির্ভীক প্রশান্ত হাসি, আশীস্‌বাহী শান্ত বাণী ও পরামর্শ সম্রাটের অনেক জ্বালাই জুড়িয়ে দিত, অনেক গুরুভার লাঘব করত, অনেক দুশ্চিন্তা অপনোদন করত। বীরবলও

এই সরল বিশ্বাসের, এই ভালবাসায় অপব্যবহার করেননি কোন দিন। বয়সে তিনি আকবরের চেয়ে বছর খানেকের বড় ছিলেন তবু রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা অন্য কারও চেয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র কম ছিল না। হাসি ও তামাসায় মাঝে কোনদিনই তিনি রাজকায় সম্মান প্রদর্শন কার্য্যে বিস্মৃত হতেন না। তাঁর চূড়ান্ত হাস্যোদ্দীপক উক্তির মধ্যে কোন দিন বড় একটা অপরের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা, অসম্মান অবমাননা জেগে ওঠেনি। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবজ্ঞান ছিল তাঁর উক্তির বৈশিষ্ট। নিছক ভাঁড়ামী বা জোর ক'রে অশ্লীলভাবে অপরকে হাসাবার চেষ্টা তাঁর ছিল না। সে হাস্যরস ছিল মার্জ্জিত, শ্লীলতামণ্ডিত এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। যথেষ্ট যথাতথা উক্তি ও ভাষণের বদ্ রোগ তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর শিক্ষা ছিল, সংস্কৃতি ছিল, বুৎপত্তি ছিল আর ছিল দায়িত্বজ্ঞান। দর্শনে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাই তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচার করতেন, জনগণমনকে সরস সহজ শিক্ষার সারে ফলবান ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন আজীবন। প্রাণভরা মনভরা হাসি ও খুসির মধ্য দিয়ে লোকে তত্ত্ব ও তথ্য গ্রহণ করুক, এই ছিল তাঁর মনের একান্ত কামনা।

রাজনীতি চর্চ্চায় তিনি নাম করেন নি, ধর্ম্ম প্রচারক হিসেবেও কেউ তাঁকে মনে করেন না, কেননা—দীন ইলাহী ব'লে যে ধর্ম্ম তিনি আকবরের সহযোগিতায় প্রচার করেন তা' বিস্তার লাভ করেনি এবং তার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নামও প্রচারক হিসেবে মুছে গেছে। বীরত্বে তিনি পুরোভাগে এসে দাঁড়াননি কোন দিন। কবি হিসেবেও তিনি বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছেন। কেবল হাস্যরসিক হিসাবেই বীরবল আজো ভারত ইতিহাসে অদ্বিতীয় অমরতায় বেঁচে আছেন। উর্দ্দ্ ভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, আর কবিতা রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আর এই কারণেই সম্রাট্ তাঁকে 'রাজা বীরবল' বলে ডাকতেন, এবং মোগলরাজকোষ থেকে প্রতি মাসে দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

ফলে, তাঁর মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর উপর বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, ব্রাহ্মণের এত প্রাধান্য ও শক্তি মুসলিম রাজ্যে তারা সইতে পারে না, তা' খর্ব্ব করবার চেষ্টায় তারা উঠে পড়ে লেগেছিল। তারা বীরবলকে জ্যাঠা, ফাজিল, বাচাল, বাক্সর্ব্বস্ব ব'লে গালাগাল দিত। তবু ব্রাহ্মণ ধৈর্য্য হারান নি। শেষকালে তাঁর ভাঁড়ামির অসত্য বিবরণ নিয়ে তারা রাজদ্বারে হাজির হল। সম্রাট্ শুধু বলেন, তাঁর মুসলিম অমাত্যদের মধ্যে দশজনকে তিনি স্বেচ্ছায় হাসিমুখে বিদায় দিতে পারেন কিন্তু বীরবলকে কোনোমতেই বিদায় দিতে পারেন না। পরদিন তিনি এক মজা করলেন।

তাদের নির্দ্দেশ দিলেন চার ফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া একটা লেপ জোগাড়

করতে। তারা লেপ নিয়ে এসে হাজির হল। সম্রাট্ বিনা বাক্যব্যয়ে মাটির ওপর শয়ন করলেন, আর লেপটা দিয়ে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিতে বললেন। অভিযোগকারী অমাত্যগণ ত হতভম্ব! এত ছোট লেপে অতবড় একটা মানুষকে কি ক'রে ঢাকা দেওয়া সম্ভব! তারা সবাই সরে দাঁড়াল। সম্রাট্ বললেন, আচ্ছা বেশ, দেখা যাক্ বীরবল পারে কি না। তারা আনন্দিত হল এই ভেবে যে ও-কাজ বীরবল কেন সকল বুদ্ধিমান লোকেরই অসাধ্য। কিন্তু বীরবল - নিঃশব্দে এসে সম্রাটের পা দুটো আগে মুড়ে দিলেন, তারপর লেপটা সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে টেনে দিলেন। সম্রাটের দেহের কোনো অংশই আর অনাবৃত রইলোনা। দেখে ত সবাই অবাক্ আর অপ্রতিভ!

এরপর থেকে তারা আকবরের সামনে আর রাজা বীরবলের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে ভরসা পেত না। তবু সভার মধ্যে হেঁয়ালি আর রহস্যপূর্ণ প্রশ্নবাণে সবাই মিলে তাঁকে কোনঠাসা করতে সদাই ব্যস্ত থাকত। কিন্তু বীরবল অপ্রতিভ হবার নন।

আর একটা ঘটনার কথা ব'লে শেষ করি। একবার তামাকের ক্ষেত্রে এক গাধা দেখে সম্রাট্ আকবর বীরবলের দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন, আচ্ছা বীরবল, তামাক জিনিষটা এতই খারাপ, বোঝো, যে ব্যাটা গাধা পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে তামাকের উগ্র গন্ধ স'য়ে চুপটী করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—হ্যাঁ, মহারাজ, মানুষগুলোও ও ব্যাটারই মত ওই খারাপ জিনিষটারই জন্যে বুদ্ধি খরচ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে তবু চায়না।

বলা বাহুল্য, সম্রাট্ প্রাণ ভরে একচোট হেসে নিলেন, আর আমরাও কি এর পর না হেসে থাকতে পারি?

বিদ্যুৎ-চমক

(একাঙ্কিকা)

মন্মথকুমার চৌধুরী

নাটকের নরনারী

মঞ্জুলা দাশগুপ্ত	কলেজের মেয়ে
সুলতা	মঞ্জুলার মাসতুত বোন
পরমেশ দত্ত	ডাক্তার
রাহুল	মঞ্জুলার বন্ধু

স্থান—কোলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবার
সময়—সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা

দৃশ্যপরিকল্পনা

তোমার কথা আমার প্রাণে সুর জাগালো
সুর জাগালো
হারানো দিনের স্মৃতি আমার মনের বনে
দোল দিল !
আঁধার রাতে তোমার ভীরু চাওয়া
বাসর ঘরে পেল না তার কায়া
আপন হাতে টানলে তুমি
তবো যবনিকা।
অনেক দিনের গভীর গোপন কথা
তোমায় জানি হবে না আর বলা
সেই বেদনায় জড়িয়ে দিলুম
আমার গানের মালা ॥
তোমার তরে আমার অভিমান
বিস্মরণে বীণার তারে কে বাজালো
বিরহ গাথার হয় না অবসান ॥

(তাই) তোমার কথা আমার প্রাণে সুর জাগালো
সুর জাগালো
হারানো দিনের স্মৃতি আমার মনের বনে
দোল দিল
দোল দিল ॥

গানের মাঝখানে সুলতা ঘরে ঢুকলেন, হাতে পরীক্ষার খাতা ও লাল পেন্সিল। গান শেষ হলে সুলতা অর্গানের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

সুলতা। (গম্ভীর সুরে) তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই মঞ্জু—

মঞ্জুলা। (পাশ ফিরে মৃদু বিস্ময়ে) আমার অনুমতি নিয়েও কোন কথাই জিজ্ঞেস কর না সু-দি।

সুলতা। তবু আজ জিজ্ঞেস করচি।

মঞ্জুলা। (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে) বেশ বলো। আমি তোমার সুশীলা ছাত্রীর মতো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনচি।

সুলতা। আজকালের মেয়েরা তোরা যেন কি! সব কিছুতেই ঠাট্টা আর হাসি।

মঞ্জুলা। ঠাট্টা করলুম কই সু-দি। আর হাসিটা ত দোষের নয়।

সুলতা। অনেক সময় হাসিটা মোটেই সুস্থতার লক্ষণ নয়। কথায় কথায় পাগল ছাড়া কেউ হাসে না।

মঞ্জুলা। দোহাই তোমার। ঢের হয়েচে। ড্রইং রুমকে ক্লাশ বানিয়ো না। এই চেপে গেলাম হাসি। তোমার সামনে অকারণে কক্ষণো হাসব না। কখন আবার বলে বসবে, এ যুগের মেয়েরা চপলমতি।

সুলতা। জোর করে হাসি চেপে রাখার চেয়ে বরং চপল হওয়াও ভালো। আমি যা নই, তা দেখাবার ভান করতে গিয়ে শুধু পরকেই ঠকানো হয় না, নিজেও শুকিয়ে মরতে হয়!

মঞ্জুলা। এর মানে?

সুলতা। এই যেমন একটু আগে গান গেয়ে তুমি মনের কান্নাকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেছিলে।

মঞ্জুলা। (কেঁপে উঠলো) তুমি তাই বলো?

সুলতা। আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। গানেই তার মানে স্পষ্ট। কিন্তু সংসারে যার সত্যিকার কোন অস্তিত্ব নেই, তার জন্যে কেন এই ব্যর্থ চোখের জল।

মঞ্জুলা। যা সত্যি সত্যিই মূল্যবান, তা হাত দিয়ে ধরা-ছোঁয়া যায় না সু-দি।

স্থলতা। ওটা দার্শনিকের স্বপ্ন, মাটীর মানুষের তা নিয়ে ঘরকন্না করা চলে না—

মঞ্জুলা। তা ছাড়া স্মৃতিকে ধরে রাখবার চেষ্টা কি আজ নোতুন ?

স্থলতা। যে স্থর গান হয়ে বেজে উঠবার আগেই নীরব হয়ে গেলো, তাকে তুই স্মৃতি বলিস নঞ্জু ?

মঞ্জুলা। সেই হঠাৎ মিলিয়ে যাওয়া টুকরো টুকরো মুহূর্ত্তের স্মৃতিকে বুকে ধরে আমি যদি স্থখী হই, তা'তে ক্ষতি কি স্থ-দি।

স্থলতা। তোমার নিজের ছাড়া ক্ষতি আর কারো নেই ! এ তো স্থখী হওয়া নয়, এ যে ক্ষুধার চেয়ে উপোস করার গর্বকে বড়ো করে দেখা। এতে কারো লাভ নেই। এতে নিজেকেই শুধু দুর্বল করা হয়।

মঞ্জুলা। দুর্বলতা বললেই একটা সত্যি মিথ্যে হয়ে যায় না স্থ-দি। এ যে মন। মানুষের হাত তাতে কতটুকু ?

স্থলতা। মন কি শুধু তোর একলার মঞ্জু। রাতুলের মন বলে কী কিছু ছিল না ? হুজুগের মাথায় একটা কেলেঙ্কারী কোরবার আগে রাতুল তোর কথা কী একবারও ভেবে দেখেছিল ? কে তাকে বাধা দিয়েছিল ?

মঞ্জুলা। (বেদনা-গভীর গলায়) তার বাবা।

স্থলতা। তার বাবা শুধু বলেছিলেন বিয়েতে আমার মত নেই। তবু যদি আমার অমতে বিয়ে কর– সম্পত্তিতে তোমার কোন অধিকার থাকবে না। শুধু এইমাত্র। ভালোবাসার জন্যে যে এত সহজে ভেঙে পড়তে পারে, তার মুছে যাওয়াই উচিত মঞ্জু। সম্পত্তির লোভটাই কিনা শেষকালে তার কাছে বড়ো হয়ে উঠলো। তোদের দুজনের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ালো—সমাজ নয়, সংসার নয়, তুচ্ছ সম্পত্তি। ভেবে দেখ একজন পুরুষ কত দুর্বল হ'লে তবে এই তুচ্ছায় আবদারের কাছে মাথা নোয়ায়।

মঞ্জুলা। সে দুর্বল বলেই তার ভালোবাসা দুর্বল ছিল না স্থ-দি।

স্থলতা। সে ভালোবাসায় যে জোর ছিল, তা'ই বা বুঝব কী করে ? সে কেন স্পষ্ট করে তার বাবাকে বললে না—চাইনে আমার সম্পত্তি। বেঁচে থাকলে সে কী অমন টাকা রোজগার করতে পারতো না ? এমন করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সে কার ওপর প্রতিশোধ নিলে মঞ্জু—তোর, তার বাবার, না নিজের ওপর ?

মঞ্জুলা। তা'র মত ছেলে কারোওপর প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবতেও পারে না স্থ-দি।

স্থলতা। তবে কী এমনি করে নিজের দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করলে ?

মঞ্জুলা। (উদাস ভঙ্গীতে) তা হবে।

সুলতা। (ঈষৎ ব্যঙ্গ করে) হয়ত নিজের জীবনের বিনিময়ে ভালোবাসার মূল্য দিতে চাইলে।

মঞ্জুলা। (তড়িৎ বেগে) সু-দি, তুমি এই নিয়ে ঠাট্টা করচ?

সুলতা। ঠাট্টা নয়, সত্যি কথাই বলচি।

মঞ্জুলা। সব সময় সত্যি কথাও মানায় না সু-দি।

সুলতা। তোর কাছে সে দাবী আছে বলেই বলতে ভরসা পাচ্ছি। তোকে যে আমি ঠিক মাসতুতো বোনের মত দেখিনি মঞ্জু

মঞ্জুলা। হঠাৎ এসব কথা কেন সু-দি?

সুলতা। হঠাৎ নয়—অনেক দিন থেকেই তোকে লক্ষ্য করছি। তুই যেন কেমন মন-মরা হয়ে গেচিস্।

মঞ্জুলা। এ তোমার ভুল ধারণা। আমি যা ছিলুম, তাই আছি। শুধু তোমার মনই চঞ্চল হয়ে উঠেচে মাত্র।

সুলতা। ওসব কথার ভেল্কীবাজীতে আর ভুলচি নে। তোকে স্পষ্ট করে কথা দিতে হবে। রাতুলের মতো ছেলের জন্যে কোন মেয়েই তার জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে না। তা ছাড়া যাকে কোন দিন ধরা-ছোঁয়া যাবে না, তার জন্যে দিনের পর দিন কেন এই শুকিয়ে মরা?

মঞ্জুলা। তোমার ঐ মস্ত দোষ সু-দি। বাড়ীতে এসেও স্কুল মাস্টারী উপদেশ দেওয়ার অভ্যাস তুমি ছাড়তে পার না।

সুলতা। মেনে নিলুম উপদেশ দেওয়া আমার একটা বদ্ অভ্যাস। কিন্তু স্কুল মিস্ট্রেস্‌রা কী সত্যিকথা বলতে পারে না। একটা ধোঁয়াটে কল্পনার পেছনে ছুটে চলার মানে বুঝিয়ে বলতে পারিস্?

মঞ্জুলা। আজ হয়ত সবই মিথ্যে, তোমার ভাষায় ধোঁয়া। কিন্তু একদিন ত আমাদের আকাশে সূর্য্য উঠেছিল, লাল, টুকটুকে সূর্য্য। তা কী আমাদের জীবনে কম সত্যি? সে মুহূর্ত্তের কোন দামই কী নেই।

সুলতা। একটা অতি বড় সেন্টিমেন্টাল মেয়েও এ ধরণের উচ্ছ্বাসে লজ্জা পেতো। আজ তুই এসব অদ্ভুত কথা কী বলছিস্ মঞ্জু। তোদের মত কলেজে পড়া মেয়েদের মুখে ওসব কথা শুনতে হবে?

মঞ্জুলা। কলেজে পড়েচি বলেই ত আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ সু-দি। সমাজের ছুরি যে আমাদের দু'দিক দিয়েই কাটতে চায়। নিজের মনের কথা মুখে বলতে আমাদের

সব সময়েই ভয় এই বুঝি পেছিয়ে পড়লুম, সবাই বুঝি সেন্টিমেন্টাল বলে হেসে উঠলো। তাই নিজেরা যা নই, তাই দেখাতে গিয়ে আমরা হয়ে উঠেচি কৃত্রিম, অদ্ভুত। এখন কোনটা কৃত্রিম আর কোনটা বা সত্যি, তাই আমরা ধরতে পারিনে। এখন আমরা কী করবো বলো ?

সুলতা। তোদের শুধু সহজ হ'তে বলি, সাদা চোখে জীবনকে দেখতে বলি। তুই ত জানিস্, মাসীমা তোর দিকে তাকিয়ে ওপারের দিন গুণছেন। তুই তাঁর কাছে ছেলে ও মেয়ে—দুই-ই। তোর বিয়ে না দেখে গেলে তিনি স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবেন না।

মঞ্জুলা। কিন্তু তুমি ত সবই জান। কেউ হারিয়ে গেলেই কী আমাদের মন থেকেও হারিয়ে যায় ? তার স্মৃতিকে সম্বল করে কী আমরা বাঁচতে পারিনে।

সুলতা। ও যারা বলে তারা মিথ্যে বলে, তারা শুধু নিজেকে ঠকায়। তারা জানে না ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা কী অসীম।

মঞ্জুলা। তবে মেয়েরা বাঁচবে কী সম্বল নিয়ে শুনি ?

সুলতা। এ ত নোতুন কথা নয়। মেয়েদের চাই ঘর, স্বামী, সংসার।

মঞ্জুলা। কিন্তু এসব ছাড়াও তুমি কি করে বেঁচে আছ ?

সুলতা। আমার অন্য কোন উপায় ছিল না—তাই। আমার জীবন দৃষ্টান্তও নয়, যুক্তিও নয়। বলতে পার ব্যতিক্রম।

মঞ্জুলা। মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার গৌরবটুকুও তুমি স্বীকার কর না ?

সুলতা। যে গৌরবে শুধু দূর থেকেই প্রশংসা করা চলে, সে গৌরব সম্বল করে জীবনে সুখী হওয়া চলে না।

মঞ্জুলা। (তন্দ্রিল গলায়) সুখী হওয়া! (স্পষ্টভাবে) আমাকে কী বোঝাতে চাও ?

সুলতা। কিছু বোঝাতে চাইনে, শুধু তোর মত কেড়ে নিতে চাই।

মঞ্জুলা। মত ?

সুলতা। হ্যাঁ, বিয়ে ত তোকে একদিন না একদিন করতেই হবে।

মঞ্জুলা। বিয়ে করার পরও সংসার ভেঙে যায়, তা'ও তোমার চেয়ে কেউ ভালো জানে না সু-দি।

সুলতা। সে আলাদা কথা। আমার কপাল ভেঙেচে বলে সবারই ভাঙবে, এমন ত হ'তে পারে না। এ যুগের মেয়েরা, তোরা, ভাগ্যটাকেই বা কেন এত বড়ো করে দেখবি।

মঞ্জুলা। বিয়েতে তোমরা সুখী হবে ?

সুলতা। তোর মত হ'লে সুখ রাখবার ঠাঁই হবে না মঞ্জু (কাঁধে সস্নেহ হাত রাখলো)

এমন সময় দ্বারের প্রান্তে 'নমস্কার'শব্দ উচ্চারিত হলো। দু'জনে চকিতে তাকিয়ে

দেখলো জোড়করে পরমেশবাবু দাঁড়িয়ে, মুখে মৃদুমিষ্টি হাসি

পরমেশ। দু'বোনের আলাপের মাঝখানে আমার আসাটা একটা অসময়োচিত হয়েচে বৈ কি!

সুলতা। (উৎফুল্ল ভঙ্গীতে) মোটেই না। বরং এ সময়ে আসার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি না এলে কাজগুলোর কথা আমার মনেই থাকতো না। অথচ কাল ওগুলো ফিরিয়ে দিতেই হবে। আপনি মঞ্জুর সঙ্গে আলাপ করুন। ততক্ষণ আমি কাজ সেরে নিই।

মঞ্জুলা। বুঝলেন পরমেশবাবু, এতক্ষণ উনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন. বাড়ীতে এলেও ক্লাশের কথা ভুলতে পারেন না। ওকে ছেড়ে দেয়াই নিরাপদ।

ডাক্তার ও সুলতার হাসি বিনিময় হলো।

সুলতা। (মঞ্জুলার দিকে) ডাক্তার আর মাস্টারে কিন্তু গভীর মিল— উপদেশ দেয়া দু'জনেরই পেশা কিনা।

আবার দৃষ্টি বিনিময় হলো। ডাক্তারের দৃষ্টিতে কৌতুক, সুলতার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, ডাক্তারের হাসি সুলতার মনে শিহরণ জাগালো

পরমেশ। আর কী জানেন মিস্ মঞ্জু, মাস্টারের উপদেশ না মানলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ডাক্তারকে অবহেলা করলে বিস্তর অসুবিধায় পড়তে হয়।

সুলতা। (তির্য্যক হাসিতে) সে জন্যই ত মঞ্জুকে আপনার হেফাজতে রেখে যাচ্ছি। মোস্টারের কথায় কান না দিলেও ডাক্তারকে তার মানতেই হবে।

সুলতার অস্বাভাবিক দ্রুত প্রস্থান। শেষের দিকে তার স্বর ভারী হয়ে এলো। হাসিতে বেজে উঠলো বেদনার রেশ

পরমেশ। আপনার দিদি ত আপনাকে এখানে রেখে দিয়েই খালাস। কিন্তু রোগ যদি কঠিন হয়ে উঠে, ডাক্তার সে ক্ষেত্রে নিরুপায়।

মঞ্জুলা। (ইঙ্গিতময় হাসিতে) ডাক্তারের ওপর সু-দির গভীর বিশ্বাস।

পরমেশ। সে জন্যই ত ব্যর্থতার লজ্জা আরো বেশী মিস্ মঞ্জু।

মঞ্জুলা। সু-দিকে জানলে, ও কথা আপনি বলতেন না। তা'র মতে আজকালকার যুগের মেয়েরা বাস্তবকে হাসি মুখে স্বীকার করে নেবে।

পরমেশ। (মুগ্ধ সুরে) আপনার সু-দিকে পেটি স্কুলের মাস্টারীতে মানায় না। তার আরো বড়ো সুযোগ গ্রহণ করা উচিত ছিল।

মঞ্জুলা। সু-দির বাস্তব নিয়ে এই বাড়াবাড়িতে আপনিও সায় দেন?

পরমেশ। এ ত বাড়াবাড়ি নয়, এ যে শুধু কঠিন সত্যকে সবল মন দিয়ে স্বীকার

করে নেয়া। সবাই তা পারে না। তাইত বলি আপনার সু'দির মন আশ্চর্য্য রকমের বৈজ্ঞানিক।

মঞ্জুলা। অর্থাৎ আপনি বলতে চান জীবনে বড়ো স্বপ্ন কল্পনা এ সবের কোন স্থানই তাঁর মনে নেই।

পরমেশ। আমি তা বলিনে। তবে কল্পনা যখন মুছে যায়, স্বপ্ন যখন ভাঙ্গে, তখন তাকে স্বীকার না করাই অসুস্থতা। আপনাকে একটা গল্প বলি শুনুন। আমরা সেবার ফিফ্‌থ্ ইয়ারে। এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। দাঁতের অসুখ। তাঁকে বলা হল ওপরের পাটীর সবগুলো দাঁত না ফেললে ভয়ানক কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু মহিলাটি কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন,—ওতে মুখের সৌন্দর্য্যটাই নষ্ট হয়ে যায়। শুনে হাসব না কাঁদব—(একটু থেমে) জীবনের চেয়ে তাঁর কাছে সৌন্দর্য্যটাই বড়ো হয়ে উঠলো।

মঞ্জুলা। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন মেয়েদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়ে বেঁচে থাকা না-থাকা দুই-ই সমান।

পরমেশ। এই খেলো সেন্টিমেন্টই আমাদের মনকে দুর্বল করে— কল্পনাও নয়, স্বপ্নও নয়। সৌন্দর্য্য ছাড়া মেয়েদের বেঁচে থাকবার আর কোনও সম্বলই কী নেই?

মঞ্জুলা। হয়তো মেয়েটি তাই ভেবেছিলেন—

পরমেশ। তিনি ভাবেন নি, অনেক দিনের সংস্কার তাঁর সত্য ভাবনাকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন কোরে রেখেছিল। তাই আরো দশজন মেয়ের মত নিজকে তিনি শুধু ঠকাচ্ছিলেন। আর কী জানেন, নিজকে যারা ঠকায়, অন্যকে দেবার মত তাদের কিছু থাকে না।

জানলা দিয়ে চাঁদের ঝলমল, কচি আলো এসে পড়লো। জবাব না দিয়ে মঞ্জুলা ক্ষিপ্র হাতে জানলাটা বন্ধ করে দিলো

পরমেশ। জানলাটা বন্ধ করে দিলেন বড় ?

মঞ্জুলা। চাঁদের আলো আসছিল কি না, ফুট্‌ফুটে মিষ্টি আলো। তাই এতটা কাব্য হয়ত আপনার সইবে না।

পরমেশ। আপনার ভুল ধারণা এখনও কাটল না মিস্ মঞ্জু। কাব্য আমি সইতে পারি নে, এ আপনার জোর করে চাপিয়ে দেয়া অপবাদ মাত্র। আমরা শুধু কাব্য নিয়ে নিজকে হারাতে চাইনে। আকাশে না উড়ে, মাটীতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে কার কী আপত্তি ?

মঞ্জুলা। সু-দির মতের সঙ্গে আপনার মতের দেখছি আশ্চর্য্য মিল। তিনি বলেন কাব্যের মাপ্‌কাঠিতে জীবনকে তৈরী না করে, জীবনের ধারা অনুযায়ী কাব্য গড়ে তোলাই আজকের মানুষের পক্ষে বেশী নিরাপদ।

পরমেশ। অর্থাৎ সোজা ভাষায় এই দাঁড়ালো, কোন মিথ্যে সেন্টিমেন্টের জন্যে

জীবনকে যেন আমরা ব্যর্থ হতে না দিই। কিন্তু একটা জায়গায় তাঁর সঙ্গে আমার মিল নেই। তিনি যা শুধু নিজে মুখে বলে থেমে যান, আমি তা কাজে ফলাই। (প্রচ্ছন্ন হাসিতে) ডাক্তার আর মাস্টারে এখানেই তফাৎ।

কথা বলতে বলতে পরমেশ জানলার কপাট খুলে দিলেন। উঁকি দেয়া চাঁদ অজস্র হাসিতে ছড়িয়ে পড়ল। পরমেশ গভীর রোমাঞ্চে মঞ্জুলার পাশে বসে তার হাতখানা টেনে নিলেন। আংটি পরিয়ে দিয়ে নিবিড় গলায় বললেন

শুধু আকাশের চাঁদ সাক্ষী রেখে আংটি তোমার হাতে পরিয়ে দিলুম মঞ্জু!

মঞ্জুলা হাসিতে ঝলমল করে উঠলো

মঞ্জুলা। আপনার বুঝি ভয় হচ্ছে, পাছে আমি 'না' বলে বসি। তাই সাক্ষী রাখচেন।

পরমেশ। (নিবিড় গলায়) এখন থেকে আর আপনি নয় মিস্ মঞ্জু। বলো তুমি, নইলে—

আন্তরিকতায় মঞ্জুলার হাতে মৃদু চাপ দিলে। সেই মুহূর্ত্তে ব্যস্ত পদে লাল নীল পেন্সিল ও পরীক্ষার খাতা হাতে নিয়ে সুলতার প্রবেশ। মঞ্জুলা ও পরমেশ সান্নিধ্যকে কেটে দিলো সলজ্জিত ত্রস্ততায়

সুলতা। স্কুল মাস্টারী করা কী ভয়ানক ঝকমারি। গাধার মত খেটেও কাজের কুল কিনারা নেই। এই দেখুন না মিস্টার দত্ত। সন্ধ্যা থেকে খাতায় চোখ মিশিয়ে আছি, তবু একগাদা খাতা এখনো দেখাই হয় নি। অথচ কালই লাস্ট ডেট।

পরমেশ। আপনার বড্ড স্ট্রেন হচ্ছে সুলতাদেবী। দেখবেন কাজের নেশায় শরীরের দিকে নজর দিতে ভুলে যাবেন না যেন।

সুলতা। শরীরের দিকে নজর না দিয়েও যে কাজের থৈ পাচ্ছি না মিস্টার দত্ত। সেই ত হয়েচে মুস্কিল। কিন্তু এ কী, আপনাকে চা দেয় নি? (মঞ্জুলার দিকে অসন্তোষে) মঞ্জু!

মঞ্জুলা। সত্যি, বড্ড ভুল হয়ে গেচে। তার সব দোষটা কিন্তু আমার নয় সু-দি।

মঞ্জুলা যেতে যেতে বললে

ডাক্তাররা রোগী পেলে সহজে ছাড়তে চায় না।

সুলতা। এখনো ওর ছেলেমানুষী যায় নি পরমেশবাবু।

পরমেশ। ও বয়সে একটু লাইভ্লি হওয়াই ত স্বাভাবিক।

সুলতা। কিন্তু তার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই উচিত নয়। এই চাঞ্চল্যের

জন্যে ও যে কোন কিছুকেই সহজভাবে নিতে পারচে না পরমেশবাবু।

খানিকক্ষণ দু'জন চুপচাপ। কথাটার গোপন ইঙ্গিত দু'জনের বুকেই অর্থময় প্রতিধ্বনি জাগালো, অথচ মুখ ফুটে কেউ স্পষ্ট করে কিছু বললে না

সুলতা। (দীর্ঘশ্বাস) ভাগ্যের দোষে আমার না হয় অল্প বয়সেই কপাল ভাঙলো, কিন্তু মঞ্জুও যে ছন্নছাড়া হয়ে জীবন কাটাবে, তা দেখতে সত্যিই বুকে বাজে পরমেশবাবু।

পরমেশ। (নিষ্কম্প গলায়) মঞ্জু মত দিয়েচে সুলতা দেবী। এখন মাসীমার মতের যা অপেক্ষা।

সুলতা। (চকিত গলায়) মত দিয়েচে ?

হঠাৎ যেন সুলতা নিষ্প্রভ, নির্জীব হয়ে এলেন। এই শুভ সংবাদে সুলতার আকস্মিক ভাবান্তর পরমেশকে বিস্মিত করলে। সুলতা কিন্তু মুহূর্তে আত্ম-সংবরণ করলে। জোর করে হাসি টেনে বললে

তাইত বলি ডাক্তারকে মানতেই হবে।

ডাক্তারের সঙ্গে মুহূর্তের জন্যে চোখাচোখী হলো সুলতার—প্রণয়-চেতনায় আচ্ছন্ন বিহ্বল দৃষ্টি। ডাক্তার সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। অস্ফুট একটা কিছু বলবার আগেই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। সুলতা রিসিভার তুলে নিলো

হ্যালো, পরমেশবাবু, হ্যাঁ এখানেই আছেন …জরুরী টেলিগ্রাম……আচ্ছা এক্ষুনি বলচি (ডাক্তারের দিকে) আপনার বাড়ী থেকে ডাকচে। কী একটা জরুরী টেলিগ্রাম।

পরমেশ। (উঠে দাঁড়িয়ে) তা হ'লে মঞ্জুকে বলবেন, বিশেষ তাড়াতাড়ির জন্যেই দেখা হলো না। আচ্ছা, নমস্কার।

পরমেশ চলে যাওয়ার একটু পরেই চা নিয়ে মঞ্জু এলো

মঞ্জুলা। ডাক্তার আবার কোথায় পালালেন ?

সুলতা। বাড়ী থেকে ফোনে ডাকলে কি না।

মঞ্জুলা চায়ে চুমুক দিলো

সুলতা। (ক্ষুণ্ণ গলায়) তুই বিয়েতে মত দিয়েচিস্, একথা আমাকে আগে বলিস্ নি কেন ?

মঞ্জুলা। (রোমাঞ্চ-দীপ্ত ভঙ্গীতে) ইচ্ছে ছিল পরমেশবাবুর কাছ থেকে কথাটা শুনে তুমি চমকে যাও !

সুলতা। (বিবর্ণ সুরে) ও !

মঞ্জুলা। তুমি কী এ বিয়েতে খুসী হওনি সু-দি ?

সুলতার গলায় সস্নেহে হাত রেখে

সুলতা। তোর বিয়েতে আমার চেয়ে কে বেশী খুসী হবে বল।

মঞ্জুলা। তবে যে মুখ ভার করে বসে আছ। তোমার মুখে হাসি নেই কেন?

সুলতা। (ছেদ দিয়ে) মুখে হাসলেই বুঝি হাসা হলো?

সুলত প্রাণপণ চেষ্টায় হাসি টানলেন

আমি এবার যাই, খাতাগুলো আজ রাত্রের মধ্যেই শেষ করতে হবে কি না।

সুলতার গতি-ভঙ্গীতে একটি করুণ রেখা ফুটলো। মঞ্জুলা বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে নভেল পড়তে সুরু করলে। খানিকক্ষণ নীরব। তারপর 'খুট' করে শব্দ হলে। একটি অস্পষ্ট ছায়া-মূর্ত্তি তার দিকে এগিয়ে আসচে। মঞ্জুলা মনে মনে ভয় পেলেও বাইরে কঠিন ভঙ্গীতে বিছানায় উঠে বসল। টেবিল ল্যাম্পের আলোতে আগন্তুকের মুখ স্পষ্ট হলো। এবার মঞ্জুলা আতঙ্কে, বিস্ময়ে, আকস্মিকতায় অস্ফুট গলায় বলে উঠলো—'তুমি?' রাতুল ক্ষিপ্রভঙ্গীতে আঙুল মুখে দিলে। মঞ্জুলার কাছে এসে দাঁড়ালে। মঞ্জুলার দৃষ্টি বিভ্রান্ত, আচ্ছন্ন

রাতুল। (নীচু গলায়) আস্তে, ওঘরে এখনো আলো জ্বলচে। বাড়ীর লোকেরা এখনো জেগে, জানাজানি হ'লে কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না।

মঞ্জুলার নির্ব্বোধ ভীত দৃষ্টি

রাতুল। এ কী, তুমি কাঁপচ যে?

মঞ্জুলা। (প্রাণপণ চেষ্টায়) আমি, আমি...... (স্বর ডুবে গেলো)

রাতুল। (স্নিগ্ধ হাসিতে) ভয় নেই। আমি ভূত নই। আমি মরি নি। আমি তোমার রাতুলদা---

মঞ্জুলা ভয়ের প্রথম ঝাপটা কাটিয়ে উঠলে। সে জড়তা ঝেড়ে সাজা হলে

রাতুল। ভূত কী এমন করে হাসে, না কথা কয়? আর শাস্ত্রে কী বলে জান ত? ভালোবাসার পাত্রকে ভূতেরাও অনিষ্ট করে না।

মঞ্জুলা। (মৃদু করুণ গলায়) তবে তোমার সেই চিঠি, খবরের কাগজের সংবাদ, এসবের মানে?

রাতুল। (অন্তরঙ্গ গলায়) খবরের কাগজওয়ালারা খবর তৈরী করেই খালাস। তার সত্যি মিথ্যে নিয়ে তাদের ভাবনা নেই।

মঞ্জুলা। (দ্রুত গলায়) তবে কি চিঠিটাও তোমার হাতের লেখা নয়?

রাতুল। চিঠিটা সত্যিই ঝোঁকের মাথায় লিখেছিলুম। আর সে লজ্জায়ই তোমার

কাছে অ্যাদ্দিন ধরা দিতে পারি নি। কিন্তু আজ আর না এসে পারলুম না।

মঞ্জুলা। ঠিক বুঝলুম না ত ?

রাতুল। সব বলচি শোন। বাবা যখন আমাদের পরস্পরের মনের ভাব বুঝেও বিয়েতে মত দিলেন না, তখন আমি ভেঙ্গে পড়লাম। অবিশ্যি তাঁর অমতে তোমাকে বিয়ে আমি করতে পারতুম, কিন্তু তা হ'লে সম্পত্তি হারাতে হতো। নিজের উপার্জ্জন ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেরই আমার আস্থা ছিল না। তাই সে সাহস হলো না। জীবনটা মাত্র হলো অর্থহীন, আর অর্থহীন জীবনের বোঝা বয়ে লাভ কী। মরতে গেলাম নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হঠাৎ নদীর জলে ভেসে উঠলো তোমার ছায়া, পারলাম না, কিন্তু তোমার কাছে ফেরাও হলো না। মনে পড়লো—গত রাত্রের তোমার চিঠি ডাকে দেয়া হয়ে গেচে। সে চিঠি পড়লেই তোমার চোখে আমি অনেক ছোট হয়ে যাব। তাই বেরিয়ে পড়লুম অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু বেশি দিন তাও সম্ভব হলো না। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে একটা ভুলই না হয় করেচি, তাই বলে বাকী জীবনটা সে ভুলেরই জের টানব কেন ? তাই ফিরে এলাম…

বাইরে মৃদু করাঘাত হলো। "মঞ্জু, আসতে পারি কি ?" ডাক্তারের স্বর শুনে মঞ্জু কেঁপে উঠলো'—দু'জনের চোখে মুখে উত্তেজনা। মঞ্জুলার মাথায় বুদ্ধি এলো। নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে আলমিরার পেছন দেখিয়ে দিলে রাতুলকে। রাতুল তড়িৎ গতিতে আত্ম-গোপন করলে। মঞ্জুলা অজিত কাটিয়ে দরজা খুললে। ত্রস্তভাবে পরমেশ কামরায় ঢুকলে

মঞ্জুলা। এই যে আপনি, আমি ভেবেছিলাম—

পরমেশ। (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) আমি ও ভাবিনি মঞ্জু। কিন্তু আমার বড্ড তাড়াতাড়ি। সুলতাদেবীকে শীগ্‌গির ডেকে দেবে ?

মঞ্জুলা। আপনি বসুন না।

মঞ্জুলার প্রস্থান। ডাক্তার উদ্বিগ্নভাবে মাসিক কাগজে চোখ দিলেন। সুলতা ঘরে ঢুকল

সুলতা। আপনাকে বড্ড ব্যস্ত মনে হচ্ছে।

পরমেশ। ভয়ানক। বাড়ীতে গিয়েই পেলাম টেলিগ্রাম Start Immediately, যুদ্ধে যাবার আবেদন মঞ্জুর।

সুলতা। (গভীর উদ্বেগে) আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন ? কই, এসব কথা আগে বলেন নি ত।

পরমেশ। আমি কোন দিনই ভাবিনি যে আমার ডাক পড়বে। এমন কি দরখাস্তের কথাও আমার মনে ছিল না।

সুলতা। মঞ্জুর কথা ভেবে দেখেচেন? বিয়েটার কী হবে?

পরমেশ। (মাথা নুইয়ে) আপাতত বন্ধ রইল। (হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আমার যে আর বেশি সময় নেই। মঞ্জু কোথায় গেল?

সুলতা। ও বোধ হয় আপনার জন্তে চা তৈরী করচে। কিন্তু আমি ভাবচি ওর ভাগ্যের কথা। ভগবান বুঝি ওর কপালে সুখ লেখেন নি। আপনাকে একটা কথা অ্যাদ্দিন ইচ্ছে করেই বলিনি ডাক্তারবাবু। আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে আর একটি ছেলের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের ঠিক হয়। কিন্তু ছেলের বাবার মত না থাকায় শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে ভেঙে যায়। ছেলেটি ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করে বসে। সেই থেকে মঞ্জুর মন ভেঙে যায়। আমাদের আশা ছিল আপনাকে পেয়ে ওর মরা মন বুঝি আবার তাজা হয়ে উঠবে। কিন্তু ··· এই যে মঞ্জু আসচে। আপনারা তা হলে কথাবার্ত্তা বলুন। নমস্কার।

সুলতার চোখে করুণ, কোমল দৃষ্টি

পরমেশ। হয়ত শেষ নমস্কার। ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে।

সুলতা। (মমতা জড়ানো গলায়) আমরা সে সুদিনেরই ভরসায় অপেক্ষা করে রইলুম।

কোমল হাসি ছড়িয়ে সুলতার প্রস্থান। মঞ্জুলা চায়ের কাপ এগিয়ে দিলো পরমেশকে

পরমেশ। না, আজ আর চা নয় মঞ্জু। আমার সময় খুবই অল্প। বেশি কথা বুঝিয়ে বলবারও সময় নেই। শুধু এইটুকু জেনে রেখো, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

মঞ্জুলা। যুদ্ধে?

পরমেশ। হ্যাঁ, হঠাৎ ডাক এসেচে। কিন্তু সাধারণ মেয়েদের মত তুমি ভেঙে পড়বে না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

মঞ্জুলার হাত মুঠোয় চেপে আবেগ-পূর্ণ গলায়

আমি একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরব, এতে তোমার খুসী হওয়াই উচিত। দূরে যাচ্ছি বটে, কিন্তু মনটা রইলো তোমার কাছে।

মঞ্জুলা চকিত দৃষ্টিতে আলমিরার দিকে তাকালে। পরমেশ ভাবলে আসন্ন বিচ্ছেদে মঞ্জুলা মুষড়ে যাচ্ছে। তাই সান্ত্বনার সুরে

আমার মন বলচে আবার আমি ফিরে আসব—তোমার পাশে, তোমার কাছে। তোমার ভালোবাসার জোরে আমার সব বিপদ কেটে যাবে।

ঘরে আর একটি প্রাণীর কথা স্মরণ করে মঞ্জুলা রক্তিম হয়ে উঠলো। পরমেশ নিবিড় আন্তরিক গলায় কাছে এসে বললেন—মঞ্জুলার হাত মুঠোয় টেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচে মঞ্জুলা কেঁপে উঠলো

মঞ্জুলা। তুমি নিরাপদে ফিরে আসবে, এ ত আমাদের সবারই মনের কথা।

পরমেশ। মনের কথার চেয়ে বড়ো সত্য কিছু নেই মঞ্জু। তোমার আশ্বাসই বিদেশে আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

ডাক্তার মিনিট দুই মঞ্জুলার হাতের স্পর্শ-রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। তারপর করুণ দৃষ্টিপাত করে বেরিয়ে গেলেন। মঞ্জুলা তাকে দরজা পর্য্যন্ত অনুসরণ করলে। রাতুল পর মুহূর্ত্তে বেরিয়ে এলো

রাতুল। ব্যাপার ত জটিল বলে মনে হচ্চে।

মঞ্জুলা। (লাস্যের দ্যুতি ছড়িয়ে) হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তোমার পয়া ভালো, তাই সব জলের মতো সহজ হয়ে গেচে। সবার চাপে পড়ে শেষ মুহূর্ত্তে ওকে বিয়ে করতে আমি রাজী হয়েছিলুম। ওকে ভালো না বাসলেও, ভালোবেসেচি একথা ভেবেও সুখী হওয়ার চেষ্টা করছিলুম অনেকটা তোমার ওপর প্রতিশোধ হিসেবে। কিন্তু দেখলে ত বিধাতার বিধানকে ব্যর্থ করে দেবার সাধ্য মানুষের নেই।

রাতুল। আমারও বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। প্রেমের যা অভিনয় করছিলে ···

মঞ্জুলা। মোটেই না, অভিনয় আমার হয় না। তবে চেনাশোনা কেউ কেউ দল ছেড়ে যাচ্ছে শুনলে ভাবনা হওয়ারই ত কথা···

রাতুল। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আয়ু থাকলে উনি ফিরে আসবেনই। আমারই কথা মন্দ কী? মরতে গিয়েও মরা হলো না।

মঞ্জুলা। (লঘু পরিহাসে) তবে ত আরো মুসকিল। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বলবে মঞ্জু, তোমার ভালোবাসার জোরে আমি ফিরে এসেচি আর সে জোরে তোমাকে আমি পাবই।

রাতুল। সে জোরকে জোয়ারে ভাসিয়ে দেবার জন্যে তোমার পাশে রইলো রাতুল। আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবেসেছিলাম, প্রয়োজনের তাগিদে নয়, প্রতিক্রিয়া থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে নয়—এ যে শুধু জ্বলে-ওঠা, এ যে অদ্ভুত রহস্যে কেঁপে-ওঠা, এ যে অন্ধ আকর্ষণে মনের মাঝে মনকে মিলিয়ে দেয়া—এর কাছে সব বিশ্বাস,

সব যুক্তি, ম্লান হয়ে যাবে মঞ্জু।

মঞ্জুলা। রাতুল দা (আকুতিপূর্ণ গলায়)

রাতুল। আমার কথা শেষ করতে দাও। আজ আমার জোরকে বাধা দেবার জন্যে তোমার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। আজ তুমি একা, অসহায়। (রোমাঞ্চ স্নিগ্ধ হাসিতে) না মঞ্জু? তাই আমি ভালবাসার জোরে তোমাকে টেনে নিলুম আমার বুকে, আমার···[মঞ্জুকে গভীর আবেগে বুকে আকর্ষণ করলে। শেষ কথা ডুবিয়ে দিয়ে দ্রুত যবনিকা নেমে এলো।]

সঙ্গীতাংশ হিরন্ময় দাশগুপ্ত রচিত

নানা নাটকের নট-নটী সমাবেশে
রণভেরী আজ বাজিছে নানান্ দেশে।
তাই কহি আজ—
হে রাজাধিরাজ
নট-নটী নয়, নাটকই সর্বনেশে।

আবেদন

মহ্‌বুবুর রহমান খাঁ

হে মনীষীবৃন্দ আজি ভিড় করো নাক’
দয়া কোরে দূরে সরে থাক।

প্রাঙ্গণে আসিতে দাও সহজ আলোক
হৃদয়ে বাজিতে দাও সহজ রাগিণী
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-হীন দুটী চোখে
ধীরে ধীরে লবে আজি চিনে
বনের সুগন্ধ ফুল ছাড়ায়ে টবের ক্ষুদ্র মায়া
গৃহের একটু আলোছায়া
পথে যে বাহির হলো অতি সঙ্গোপনে,
আপনারে মিলাইতে চাহে যে গগনে
একাগ্র আলোকে।

হে মনীষীবৃন্দ আজি আমার লাগিয়া ক্ষুদ্র শোক
মূর্চ্ছা যেয়ো নাক’
পূজারী রয়েছে যারা তাহাদের উচ্চ স্বরে ডাক।

আমরা দেবতা যারা তারা চিরদিন
রহে পূজাহীন

বন্ধুর শাসন তারা পায়
একাসনে বসে তারা শান্ত হৃদয়ের আলিসায়।

আজি আর তোমাদের যেন পদচিহ্ন নাহি পড়ে।

মনের নিভৃততম একান্ত গোপন পথ’পরে।

প্রবল সহজ আমি আজি
বর্ণহীন গন্ধময় ছোট ফুলে ভরিলাম সাজি।

আজি আর তোমাদের যেন পদচিহ্ন নাহি পড়ে
মনের নিভৃততম একান্ত গোপন পথ’পরে।

প্রবল সহজ আমি আজি
বর্ণহীন গন্ধময় ছোট ফুলে ভরিলাম সাজি।

প্রাকৃতিক

(উপন্যাস)

দ্বিতীয় খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদ

সরোজকুমার মজুমদার

এ বাড়ীতে আজ বাড়ো রকমের ভোজের আয়োজন করা হ'য়েছে। বীরেনের পাশের খাওয়া। বীরেন পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে সেকেণ্ড হ'য়েচে। এতটা সাকল্য অকল্পিত, তাই আনন্দের পরিমাণ একটু বেশী রকমের হওয়াই স্বাভাবিক।

পরিচিতদের মধ্যে নিমন্ত্রণ করতে কারুকেই অনাদিবাবু বাকী রাখেন নি। সবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে বলেচেন, এই একই কথা,— দয়া ক'রে একবার আসবেন পরশু-দিন আমাদের বাড়ীতে। সেজ ছেলে বীরেন, বীরু, বি-এস্-সি পাশ ক'রলো কিনা—হ্যাঁ, তা আপনাদের আশীর্ব্বাদে রেজাল্ট বেশ ভালই ক'রেচে— ফার্স্ট আর হ'তে পারলো না, যে পার্শালটি আজকাল ঢুকেছে আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে, সেকেণ্ড হয়েচে— তা ছাড়া কেমিষ্ট্রিটা ভারী শক্ত সাবজেক্ট! বললুম ল-তে ঢোক, এতদিন যখন বেকে ছিলুম, একটা কিছু করে দেবোই। তা ছেলে হায়ার স্টাডি, হায়ার স্টাডি ক'রে অস্থির। তা হ'লে ঐ কথা রইলো, সাতটা টু সাড়ে সাতটার মধ্যেই আসবেন। না, না তেমন কিছুই নয়, সবাই মিলে একটু আহ্লাদ করা আর কী। আর সাবাইকে নিয়ে বড়ো একটা মেলা মেশা হয় না। এই একটা উপলক্ষ্য হলো বুঝলেন না। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

উৎসবো দিনেই, আনন্দের দিনে প্রকাশের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে যায় কেন, এ রহস্যটা শীলা ঠিক উপলব্ধি ক'রতে পারে না। রাঙাদার সাফল্যে ছাত্রজীবনের কৃতিত্বে সে মনে পরিতৃপ্ত হ'য়েচে যতো, গর্ব্বিত হ'য়েচ ততোধিক।

বীরেন, যে দিন সে জানতে পারলো তা'র পরীক্ষার ফল, সে দিন ওর চুলের গোছা ধরে টেনে ব'লেছিল,— দেখলি? এ তোদের মত দেড় পাউণ্ডের ব্রেণ নয় পাকা সাড়ে সাত পাউণ্ড। মেধা থাকা চাই, স্বভাবজাত প্রতিভার দরকার, জানিস? আর খাটুনি— অনেস্ট লেবর্ যাকে বলে। ঐ নোটীশ না টাঙালে তোর দৌড়াত্মেই ফেল হ'য়েছিলুম আর কী? তারপরে বিজয়ীর মতো মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে ব'ল্লে,— তবে যে সে দিন খুব শাসালি ফার্স্ট-ক্লাশ পাবো না। দেখলি তো— বলিনি এক্ষুণি দেড় পাউণ্ডের ব্রেণ নয়।

শীল মুখে বলেছিলো, ভারী তো পাশ করেছ! ফার্স্ট না হ'লে আর বাহাদুরী কী! সেকেণ্ড হওয়া আর লাস্ট হওয়ার মধ্যে কোনই তফাৎ নেই।

কিন্তু মনে মনে বলে উঠেছিলো,— দাদাকে রাগিয়ে দিলে ওকে দিয়ে অনেক কাজ হয়। আমার হারই যেন হয় বরাবর। সমস্ত পরীক্ষাতেই যেন রাঙাদা আমাকে এমনি করে হারিয়ে দিতে পারে।

দু- একজন বন্ধুনীর কাছে ও বীরেনের পাশের খবর জানাতে তারা যখন ব'লেচে, বলিস্ কী? ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড? তখন ও নিজেকে অসীম গৌরবান্বিতা মনে ক'রেচে। কিন্তু ভেবে ওরই আশ্চর্য্য লাগচে আজকার এই অনাবিল আনন্দোৎসবের ক্ষণে ওর মন কেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌চে।

দু-বছর আগে এমনি একটি দিনেই প্রকাশদের বাড়ীতেও উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিলো — সেটা ছিলো প্রকাশের জন্মতিথি, সেই শেষ বারই প্রকাশের জন্মোৎসব হ'য়েছিল, তার পনের দিন পরেই ওর মার মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে কাশেরও হয়েচে মৃত্যু, জন্মোৎসবের আয়োজন হয় নি।

প্রকাশকে ও একটা “শ্চিএফার” ফাউণ্টেন পেন্ উপহার দিয়েছিলো সে দিনে! বিস্ময় প্রকাশ ক'রে প্রকাশ বললো— বাজারে কী আর জিনিষ ছিল না লিলি? কলম আমার তিন তিনটে রয়েচে। একটা মানুষ এতগুলো ফাউণ্টেন পেন্ নিয়ে কী ক'রবো— অব্যবহারে নষ্ট হবে হয়তো। অথচ এই দামে অন্য কিছু দিতে পারতে—

শীলা ব'লেছিল,— না, পারতাম না। তোমার জন্মতিথিতে এই-ই আমার একমাত্র, আর কিছুই দেওয়া চলতো না। ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি কেনার তোমার নিজের টাকার অভাব নেই। তোমার স্বাভাবিক বৃত্তি লেখা। লেখাই তোমাকে যাতে পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখে, মাতৃভাষাকে যাতে পৃথিবীতে প্রতিভায় উন্নত করতে পারো ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা ক'রে তোমার জন্মের তেইস্ বছর পরের এই দিনটিতে লেখারই উপকরণ হিসাবে তোমাকে এটা সমর্পণ করলুম। কলমটি প্রকাশের হাতে তুলে দিয়ে শীলা চেয়ে দেখল চারিদিকে কেউ নেই, তারপর সহসা প্রকাশের পায়ের কাছে মাথা নত ক'রে— সলজ্জ করাঙ্গুলি দিয়ে তার পদতল স্পর্শ ক'রে প্রণাম সেরে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ভিতরের দিকে চ'লে গেল।

এই আকস্মিকতায় চমকিত হ'য়ে প্রকাশ ব'ললে, ওকি হ'লো। পায়ে হাত দেওয়া কেন? ছিঃ ছিঃ শোন শোন লিলি।

কিন্তু শীলা তখন দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে চ'লে গেছে।

শীলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো নীচে বিস্তর লোকের মেলা ব'সে গেছে।

এরই মধ্যে সুষমাকে আর সুনীলকে আবিষ্কার ক'রে নিতে কষ্ট হ'লো না। সুনীল রাঙাদার সঙ্গে হাসিমুখে হাত নেড়ে খুব আলাপ করছে। সুষমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যস্ততার ভাব, শীলা পরিষ্কার দেখলো চলাফেরা সহজ করবার জন্যেও জুতা খুলে ফেলেচে পা থেকে।

সুনীলের কাছে এসে সুষমা দু-একটা কথা ব'লেই প্রমীলাকে নিয়ে পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওর কার্যকলাপের মধ্যে স্পষ্ট বোঝা যায় এ বাড়ীর কাজকে ও কেমন নিজের মনে ক'রে নিয়েচে—উদ্যোগ ও তদ্বির করতে ও অস্থির হয়ে উঠেচে।

সত্যি, এ তার ভারি অন্যায়। রাঙাদার জন্য আজ এই আনন্দোৎসবের মাঝে দুঃখের চিন্তা ক'রে অমঙ্গল সে কখনই ক'রবে না। নীচে নেমে ও-কে সমস্ত দেখা শুনা ক'রতে হবে। সুষমাদের নিয়ে সমানে সমানে কাজ ভাগাভাগি ক'রে নেবে।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় মেজ বৌদির সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে গেল। কাছে এসে তিনি বললেন,— চোখ মুখ ফোলা ফোলা লাগছে, কোন অসুখ ক'রেছে কী?

একটু হেসে ও জবাব দিলো— না মেজ বৌদি! মাথাটা সামান্য ধরেছিলো, ক্রনিক হ'য়েছে কি না! তোমাদের অ্যাস্‌পিরিন ট্যাব্‌লেট্ হচ্ছে—

—তবে আর বেশী নড়া চড়া করিস্ না। মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে গল্প কর।

—বাঃ রে, কাজ করবো না তা বলে? ব'লে শীলা নীচে নেমে গেল।

নীচে গিয়ে সেখানকার মহামানবতার মধ্যে ও নিজেকে মিশিয়ে দিলো। পরিপাটি ও ক্ষিপ্র হাতে রাশীকৃত কাজের থেকে ও মোটামুটি রকম অনেকটা লাঘব করতে শুরু ক'রে দিলো। এ বাড়ীর কারুর মুখে আজ বিন্দুমাত্র মালিন্য ঘন হ'য়ে নেই, বদলে তা'র সবাইকার মুখ মণ্ডলেই বিদ্যুতের দীপ্তি খেলে যাচ্ছে— নিবিড় প্রশান্তি! এই শান্তিময় আবহাওয়ার মাঝে প'ড়ে অজানতেই আনন্দোদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে ও, রাঙাদার ছোটবোন শীলা! রাত্রিতে অমাবস্যার অন্ধকার যতই নিকষ কালো হোক না, স্নিগ্ধ নবারুণের আবির্ভাবে সে তমিস্রার মৃত্যু হয়, হয়তো অস্থায়ী, হয়তো সাময়িক, তবু মৃত্যু। দোতলার ঘরে থাকতে প্রকাশের স্মৃতি মনের পর্দ্দা ঘোলাটে ক'রে দিয়েছিলো। ক-ধাপ মাত্র সিঁড়ির ব্যবধান। নীচে অনাবিল আনন্দ, অফুরন্ত জীবনের দীপ্তি, উজ্জ্বল আলো— যা অন্ধকারের প্রথম শত্রু!

—সুনীলবাবু কতক্ষণ এলেন? শীলা ব'ললে।

—আমি? অনেকক্ষণ তো! আপনারই দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না!

—ওপরে ছিলুম, এই সবে নীচে নাবছি।

—ওঃ, কিন্তু বীরেনবাবু কই? ওঁকে দেখচি না তো? সুনীল ব'ললো।

—আপনি বুঝি এ দিকটায় আসেন নি? ওই যে, ওই ঘরটায় ঐ ন-বৌদির ঘরে

ওদের জলসা বসেচে— গানের, গল্পের আর, last though not the least, তাশের। হেসে শীলা নৈঋতের ঘরটি দেখিয়ে দিলো। এ-দিককার ঘর থেকে অল্প যাদের বয়স তারা স্বতন্ত্র হ'য়ে ও-ঘরে গেছে। এ-ঘরে বুড়োদের আলাপ চলবে। জমিয়ে রেখেচেন আসর অনাদিবাবু নিজে। তাঁর সমস্ত কথাবার্ত্তাকে সুন্দর এবং সহজ ভাবে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। বীরেনের সম্বন্ধে সত্য এবং কল্পিত সমস্তই তিনি গভীর ধৈর্য্যের সাথে ব'লে চলেছেন। এক ঘেয়েমি ভাঙার জন্য রস-ঘন গল্প হচ্ছে সেই সময়কার যখন তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বেঞ্চে ছিলেন, এটাও যখন অসম্ভব রকম সস্তা হ'য়ে পড়ছে তখন অনাদিবাবু রঙ্গমঞ্চ টেনে আনছেন, ক্রিকেটিয়্যর ডন্ ব্রাড্ম্যানকে, হিট্লারকে এবং মসিয়ে দালাদিয়েকে।

—ও কথা আর বলবেন না। ঝকমারী মশায়। সোজা বাঙলায় বলতে পারেন বদ্‌রেশান। জ্যুডিশ্যাল সার্ভিস্ পাওয়ার অর্থ ই হচ্ছে প্রকারান্তরে আন্দামানে দ্বীপান্তরের সামিল। তাও লোয়ার কোর্টে তবু রক্ষে মশায়, কিন্তু হাইকোর্টের বেঞ্চে মাথা একেবারে ঘোলাটে করে দেয়। সাধে কী আর জস্টিস কাম্বারল্যাণ্ড বলতেন……। না, না প্রাইভেট টিউটর আমি কোনোদিন ওর জন্যে রাখি নি। মানুষের চোখ দেখলে বলতে পারি সে কেমন তরো লোক। ও-যে একটা জিনিয়াস্ তা আমি সেই তখন থেকেই জানতুম যখন ও ছোট এতটুকুনটী ছিলো—হাত দিয়ে প্রকাশ ক'রলেন কতটা উঁচু ছিল সে; তাঁর সেজ ছেলে বীরেন —যখন সবে ও ধরেছে বি-এল-এ রে, সি-এল-এ ক্লে। কী তীক্ষ্ণ মেধা। সচরাচর আপনারা পাবেন না এমনটি! ……না, না ও এখানে এমনি আসতে চাইচে না—- ভারী লাজুক, আধ-পাগলা গোছের আর কী। ……নিশ্চয়! ট্রট্স্কী জগতের যতো কল্যাণের চিন্তা ক'রচেন, তেমন আর কেউই করেন নি।

কার্ল মার্ক্স নন, লেনিন নন্, স্ট্যালিন তো নয়ই। স্ট্যালিন তো মশাই সোজা বাংলায় খাঁটী ইম্পিরিয়ালিস্ট, ওপরে তার স্যোসালিজ্‌মের একটা ভুয়ো আবরণ রয়েচে, যেমন ধরুণ দুধের ওপরে সর। সামান্য আলোড়নেই সর স'রে যেতে দুধের রূপ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে; ……আজকের কাগজ দেখেন নি বুঝি, স্যর ম্যালকম্ ক্যাম্প্‌বেল্ দু-শো তিরাত্তর মাইল গেছেন ঘণ্টায়।

দুর্ভাগ্য বশতঃ একজন অতিথির স্যর ম্যালকমের নাম শোনা ছিল না। তিনি বলেছিলেন,— কীসে এরোপ্লেনে?

—না, না মোটার কারএ। ভাবুন তো কী টেরিব্ল স্পিড্? ওঁর কারটার ছবি ছাপিয়েছিলো আজকের কাগজে। দেখেচেন তো? বলেন কী দেখেন নি? কেন, কাগজে তো বেরিয়েছিলো। ওঃ স্টেট্স্‌ম্যান পড়েন না বুঝি? - আমার আবার কী বদ্ অভ্যাস দাঁড়িয়ে

গেছে, সকালে চায়ে ব'সে ঐ স্টেট্স্‌ম্যান্‌টা না হ'লে গলা ঠিক ভেজে না।

নৈঋত কোণে ন-বৌদির ঘরের দোর গোড়ায় এসে সুনীল একটু থামলো। চকিত দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলো ঘরের মধ্যে। চেনা অচেনা অনেক মুখই দেখা গেল ওর মধ্যে।

পিয়ানোর কাছে একটা মেয়ে ব'সে অর্দ্ধোস্ফুট স্বরে গান করছে, যার ভাষা ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু সুরের মদির ব্যঞ্জনা কানের সূক্ষ্মতমতন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে।

লঘু পাদক্ষেপ ও ভিতরে প্রবেশ ক'রলো। এ ঘরে আছে ছেলে এবং মেয়েতে প্রায় তেইশ জন— তার মধ্যে সতেরো জনকেই, দুর্ভাগ্য ওর, ও চেনে না।

একটা সোফায় পাশাপাশি ব'সে আছে মেনকা, চঞ্চল ও আরেকটী ছেলে।

-Good God ! সুনীল যে ! এস, এস ইদিকে এস। মেনকা প্রায় লাফিয়ে উঠল।

গায়িকা মেয়েটী পিয়ানো থেকে হাত তুলে নিয়ে একবার পেছন ফিরে চাইল।

ক্রমশ

হের অপরূপ উদ্ধত অঙ্গুলি
ঈর্ষার ধ্বজা তুলি'
শাসন-ভঙ্গী শোষণের চতুরালী।
কান পেতে শোন স্তাবকের করতালি।

হাবা মহীন্

কণাদ গুপ্ত

মাসদেড়েক যমে মানুষে টানাটানির পর মহেন্দ্র মা ও স্ত্রীর যত্নে ম্যানেন্‌জাইটিসের হাত থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু তার দক্ষিণ অঙ্গটা একরকম পঙ্গু হয়ে গেল। চলতে ফিরতে পারে, কিন্তু দেহটা, বিশেষ করে ডান হাত আর ডান পা'ট, সব সময়ই থর থর করে কাঁপে। কথা বলতে গেলে জিভ্ জড়িয়ে যায়, ডান চোখটা উর্দ্ধমান হওয়ায় দৃষ্টিশক্তিও বেশী দূর চলে না। বুদ্ধি কিছু অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তার শিখায় আর তেজ নাই।

প্রতিবেসীরা যেচে সমবেদনা জানায়, তার জন্য নয়, নবোঢ়া বধূটির জন্য। ক'দিনই বা বিয়ে হ'য়েছে ; মাস চারেক বৈ তো নয়, এরি মধ্যে বিধবা—তা বিধবা নয় তো কি—পঙ্গু স্বামী থাকলেই কি গেলেই কি।

মহেন্দ্রের মা দয়াময়ী কিন্তু ভাবেন, বেঁচে গেছে এই ঢের, একটু কাঁপে বই তো নয়। চাকরী হবে না। না হোক্, তার দরকারই বা কি, এত সম্পত্তি খাবে কে। ঐ একটী ছেলে, যদি মরে যেত শ্বশুরের বংশরক্ষার কি আর কোন উপায় থাকত। এত বড় প্রাচীন বংশ তাঁদের—দাদাশ্বশুর ছিলেন কোম্পানীর আমলের নামজাদা বেনীয়ান্, তাঁর জীবন চরিত বিক্রী করে কত লোক পয়সা করে, করপোরেসনের একটা বড় রাস্তা তাঁর নামে, শ্বশুরও ছিলেন একটা বড় হৌসের ম্যানেজার, স্বামী কিছু না হোন্ বিশ বছর বড়বাবু ছিলেন। এত বড় বংশটা একেবারে লোপ পেয়ে যাবে! ভাবতেও দয়াময়ী শিউরে ওঠেন। নিশ্চয়ই ভগবানের তা ইচ্ছা নয়, নইলে মহীনই বা বেঁচে উঠবে কেমন করে! কুল আলো করে একটী ছেলে নিশ্চয়ই জন্মাবে।

মাসছয়েক দয়াময়ী আশায় আশায় কাটালেন। কিন্তু সে আশা ফলবতী হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। দয়াময়ী ভাবলেন দেবতারা রুষ্ট হয়েছেন। কোমর বেঁধে তাঁদের তুষ্ট করবার সাধনায় লাগলেন। মাদুলী ও তাগা তাবিজের ভিড়ে বধূর অংগের কোন অংশই আর অনাবৃত রইল না। কিন্তু তবু দূর ভবিষ্যতে যে কোন দিন একটী নাতি এসে তাঁর শ্বশুর কুলে বাতি দেবে, এমন আভাষ পাওয়া গেল না।

অবশেষে বিদ্যুৎ ঝলকের মত একটা সংশয় তার মনে খেলে গেল। তাই নয় তো! সংশয় নিরসনের জন্য অনেক সামলে-সুমলে একটী বিনিদ্র রজনী ঠায় বসে কথা সাজিয়ে

বধূকে একদিন প্রশ্ন করলেন। বধূ রক্তাভ হয়ে নীরবে শুধু ঘাড় নাড়্‌লেন। দয়াময়ী চোখে আঁধার দেখলেন। সেদিন থেকে পেটের সন্তান হলেও মহেন্দ্র তাঁর কাছে সংসারের একটা অনাবশ্যক আবর্জ্জনায় পরিগণিত হল।

মাস দুয়েক পরে একদিন মহেন্দ্র দেখল, একটী সুন্দর, ফুটফুটে যুবা বছর বাইশ বয়স—তার পাশের ঘরখানি অধিকার করেছে; অর্দ্ধব্যক্ত প্রশ্নে এবং ইঙ্গিতে সে দয়াময়ীকে এই যুবকটীর কুলশীল সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। দয়াময়ী প্রথমে তাচ্ছিল্য করলেন, পরে ফিরে বললেন, ও আমার খুড়তুতো বোনের ছেলে, এখানে থেকে পড়াশুনা করবে, খবরদার, ওকে যেন কোনরকমে দিক্ করিস্‌নে।

সেবার জন্য মহেন্দ্রকে সর্ব্বাংশে মায়ের ওপর নির্ভর করতে হয়, কাজেই আদেশটা অমান্য করতে পারল না। ছেলেটীর নাম শুনল ভুজঙ্গ। প্রথম প্রথম ভুজঙ্গ তার সঙ্গে কথা বলতো না, পরে, বললে অবজ্ঞার সঙ্গে বলতো, শেষে একদিন তাকে হাবা বলে ডাকলে। তার ইয়ার-বক্সীরাও ওই সম্বোধনটাই বহাল রাখলে। ক্রমে পাড়া পড়শীর কাছেও মহেন্দ্র হাবা মহীন বলে পরিচিত হল। একে একে ভুজঙ্গ আর তার বন্ধু বান্ধবের ফাই ফরমাস—পান আনা, সিগারেট আনা, জল গড়িয়ে দেওয়া—চাবী বা তাসের প্যাক হারালে খুঁজে দেওয়া—খাটার ভার মহেন্দ্রের উপরই এসে পড়ল। এতে তার দেহের কাঁপুনী একটু বাড়লো। কিন্তু মা নির্ব্বাক, বধূ নির্ব্বিকার। মহেন্দ্রের অর্দ্ধ জাগ্রত চৈতন্যের কাছেও জীবনটা দুর্ব্বহ হয়ে উঠলো।

কিন্তু একদিন তার সকল দুঃখ গোলাপের কাঁটার মত সার্থক হয়ে দাঁড়ালো। তার মার কাছ থেকে শুনল সে পিতা হবে। পিতা! সংবাদটা যেন তার কাণে মধু বর্ষণ করলো। সাগ্রহ আনন্দে বধূর কাছে ছুটে এসে তার দেহের দিকে চেয়েই ফিক্ করে হেসে ফেল্‌ল। বধূ সরে গেল।

যথাসময়ে একটা সন্তান জন্মালো, মেয়ে নয়, সুন্দর, ডালিমের মত টুকটুকে একটী ছেলে। বাড়ীতে আনন্দ উৎসবের ধূম পড়ে গেল। মহেন্দ্র কাঁপা হাত দুখানি বাড়িয়ে আঁতুড় ঘরেই ছেলেকে কোলে নিতে গেল। কিন্তু মার তাড়ায় পারল না। বধূটীর ভাগ্যে কিন্তু আঁতুড় ঘরের প্রদীপালোকিত আঁধার ছেড়ে বাইরের সহজ জীবনে আর ফিরে আসা ঘটলো না। কি একটা প্রসূতি-সুলভ রোগে মারা গেল।

বছর দুই যখন ছেলের বয়স তখন মহেন্দ্র আর তাকে কোল ছাড়া করে না। মহেন্দ্রের দেহ কাঁপায় সেই সঙ্গে ছেলেটীর দেহও অল্প অল্প কাঁপে। কিন্তু মহেন্দ্র খুব সাবধান। ছেলেকে ডান দিকে কখনও নেয় না। সে দিকটা দুর্ব্বল, ছেলে যদি পড়ে যায়।

তার শ্যামবর্ণের পাশে ছেলেটীর স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ আরও উজ্জ্বল দেখায়। মহেন্দ্রের বেশ ভাল লাগে। ভুজঙ্গের ফরমাস খাটতে এখন আর তার বেজায় লাগে না, ছেলেটীকে কোলে নিয়ে পানওয়ালার দোকানে যায়, পানওয়ালা ছেলের কচি হাতে পান বা সিগারেট গুঁজে দেয়, মহেন্দ্র তাকে নিয়ে আবার ভুজঙ্গের কাছে আসে। ভুজঙ্গ হয়তো জিনিষটা নিয়ে ছেলেটাকে একটু আদর করে, কখনও চুমো খায়। ভুজঙ্গের উপর আর সে বিতৃষ্ণার ভাবও আর তার নেই। অনেক ভাল ভাল খেলনা, রঙচঙে জামা দূরের দোকানে পাওয়া যায়। মহেন্দ্র ততদূর যেতে পারে না। ভুজঙ্গ নিজে যেচে নিয়ে এসে ছেলের হাতে দেয়। মহেন্দ্রের বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে।

একদিন মহেন্দ্র দেখে ভুজঙ্গ একলা ঘরে ছেলেটাকে নিয়ে নাচাচ্ছে, চুমো খাচ্ছে, উলটে পালটে কত রকমে আদর করছে। মহেন্দ্রের দুঃখ হ'ল? আহা! বাপ তো হয় নি। করুক একটু আদর।

এক জায়গায় কিন্তু মহেন্দ্রের ভারী অসুবিধা হত। ভুজঙ্গের ঘরে তার যে সব বন্ধু-বান্ধব আড্ডা দিত, তারা সপুত্র মহেন্দ্রকে দেখলেই হাসত, কেউ জোরে, কেউ মুখ টিপে। মহেন্দ্র কোন কারণ বুঝতে পারত না। ভাবতে গেলে গুলিয়ে ফেলত। কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করত, ও বাবা, তোমার কোলে রয়েছে, ওটী কে? মহেন্দ্র কম্পমান ঠোঁটের সাহায্যে কোনরকমে হয়তো ছেলের 'ছে' টুকু উচ্চারণ করত, সঙ্গে সঙ্গে তারা হো হো করে হেসে উঠতো। সে ছেলেকে নিয়ে সরে যেত।

পাড়াপড়শীরাও অনেক সময় তাকে সপুত্র বেড়াতে দেখলে হাসত, কিন্তু কোন প্রশ্ন করত না।

ছেলে তিন বছরে পড়লে নামকরণের কথা উঠল। ভুজঙ্গ বুঝি একটু আধটু কবিতা লিখতো। দয়াময়ী তাকেই নামকরণের ভার দিলেন। দুদিন ভেবে ভুজঙ্গ তার নাম দিলে অনঙ্গ। নামটী মহেন্দ্রের কাণে ভারী মিষ্টি লাগল। ভুজঙ্গের উপর তার প্রীতি বেড়ে গেল। সে নিজে পুরা 'অনঙ্গ' শব্দটা বলতে পারে না, অস্ফুটে বলে 'অঙ', ছেলে তৎক্ষণাৎ কচি পায়ে দৌড়ে তার কাছে চলে আসে।

একদিন শুনল, ভুজঙ্গ বাড়ী যাবে। মহেন্দ্রের মনটা বিষণ্ণ হল। আহা! ছেলেটাকে কত যত্ন-আত্তি করত। নিজে যেচে সেদিন ভুজঙ্গের খুচরো কাজে সহায়তা করতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে টাইম টেবিল এগিয়ে দিল, বিছানা বাঁধার সময় কাঁপতে কাঁপতে দড়ি ধরল, কাঁপতে কাঁপতে ভুজঙ্গের বইগুলো গুছিয়ে ট্রাঙ্কে পুরলো। কিন্তু ট্রেন ফেল হওয়ায় ভুজঙ্গের সেদিন যাওয়া ঘটলো না। মহেন্দ্র আনন্দিত হোল, কিন্তু দয়াময়ীর

মনটা যেন ভার ভার দেখা গেল।

পরের দিন, অনঙ্গর একটু অসুখ হোল। মহেন্দ্র শয্যা ছাড়ল না। আগের দিন হাঙ্গামে ছেলেকে ভাল করে দেখা হয় নি, অনেকক্ষণ শুধু গায়ে ছিল, ঠাণ্ডা লেগেছে। আফশোষে অনুতাপে মহেন্দ্রর বাঁ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

রাতে ভুজঙ্গের ট্রেন। কিন্তু তখন ছেলের জ্বর বাড়ল। দয়াময়ী তবুও ভুজঙ্গকে বাড়ী যেতে বললেন। উত্তেজনায় মহেন্দ্রের কাঁপুনি দ্বিগুণিত হল। ভুজঙ্গ চলে গেলে সে ডাক্তার ডাকবে! যতখানি বাক্‌শক্তি অবশিষ্ট ছিল সমস্তটুকু প্রয়োগ করে, দুই কম্পমান হাতের সাহায্যে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করে সে ভুজঙ্গকে থাকবার অনুরোধ জানাল। শেষে উপছে কেঁদে ফেলল। অগত্যা দয়ামযী আর কিছু বললেন না। ভুজঙ্গ ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার ওষুধও দিলেন, অভয়ও দিলেন।

রাত্রি যখন বারোটা, মহেন্দ্রের ঘরে তখন মহেন্দ্র একা, আর শিশুপুত্র অনঙ্গ! দশমিনিট গেলে মহেন্দ্রের মনে পড়ল, এখন ওষুধ দেবার সময়। কিন্তু সে ভার তার ওপর নয়। তাই ডাকতে গেল ভুজঙ্গকে।

ঘরের কাছে গিয়ে দেখল, ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ, একটু অবাক হোল। ছেলের অসুখ, ভুজঙ্গ ঘুমুচ্ছে! হঠাৎ মনে হল, ভিতরে কারা কথা কইছে। কি মনে হল, দরজায় না ধাক্কা দিয়ে কান পাতল। গলা শুনে বুঝলো, া আর ভুজঙ্গর কথা হচ্ছে।

দয়াময়ী বলছিল—আজও যাওয়া হল না। কিন্তু কাল তোকে যেতেই হবে ভুজু। নইলে কেলেঙ্কাকে কিছুতেই চাপা দেওয়া যাবে না।

ভুজঙ্গ বলছে—কেলেঙ্কা আমি গেলেও চাপা দেওয়া যাবে না। বাঁশগাছে গোলাপ ফোটে না—এটুকু বোঝার বুদ্ধি লোকের আছে।

মহেন্দ্র কথাগুলোর কোন অর্থ পরিগ্রহ করতে পারল না।

দয়াময়ী একটু উষ্মার সঙ্গে বললেন, থাকুক। তুই গেলেই লোকে ভুলে যাবে।

ভুজঙ্গ—লোকে ভুললেও অনঙ্গর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা আমি কেমন করে ভুলব?

দয়াময়ী—খবরদার। অনু আমার শ্বশুর বংশের ছেলে। তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার। যা ছিল, আমি টাকা দিয়ে তা কিনে নিয়েছি।

ভুজঙ্গ—নিয়েছ। কিন্তু তাই বলে ওই হাবার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। মাসী! আমি অনুকে ভালবাসি। আমি ভাবতে পারি না ওই নড়বড়ে হাবাটাকে ও চিরকাল বাবা বলে জানবে।

কি বলছে এরা! দেহের কাঁপুনিকে জোর করে সংযত করে, বুদ্ধিকে কুয়াসার হাত থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রেখে মহেন্দ্র উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল দয়াময়ী বললেন, ভুজু, আমার টাকা নিয়ে তুই আমার সামনে চোপা করবি ?

ভুজঙ্গ দৃঢ়স্বরে বলল, মাসী, অনুকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তোমার টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও। আমার পিতৃত্বের দাবী আমি কিছুতেই বিক্রী করব না।

মহেন্দ্রের পায়ের তলায় মাটীটা দুলে উঠ্‌লো। এক মুহূর্ত্ত সমস্ত পৃথিবীটা তালগোল পাকিয়ে তার মস্তিষ্কের ভেতর যেন তাণ্ডব নাচ নেচে নিলে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে যেন দৈবী শক্তির বলে সে আপনাকে সামলে নিলে। এমন কি কাঁপুনির বেগও এমন কিছু বাড়ল না। শুধু বাঁ হাত দিয়ে রগের অধৈর্য্য শিরাটাকে চেপে ধরে আস্তে আস্তে দরজা থেকে সরে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে একটা ভীষণ শব্দে এবং শিশুকণ্ঠের একটী তীব্র আর্ত্তনাদে ভুজঙ্গ এবং দয়াময়ী সচকিত হয়ে উঠলেন। খিল খুলে বারান্দায় এসে যে দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়ল তাতে ক্ষণকালের জন্য তাঁরা একেবারে নিস্পন্দ জড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেখলেন, মহেন্দ্র কোথা থেকে অমিত শক্তি পেয়ে তার বাঁ হাতে রুগ্ন অনঙ্গের ক্ষীণ গলাটাকে দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে সেই মার্ব্বেল পাথরের মেঝের ওপর নিষ্ঠুরভাবে আছড়াচ্ছে। একবার, দু'বার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার, ··· ভুজঙ্গ ও দয়াময়ী সম্বিৎ পেয়ে বাধা দেবার পূর্ব্বেই মহেন্দ্রের শিথিল মুষ্টি থেকে অনঙ্গের দেহটা ছাড়া পেয়ে ছত্রাকার হয়ে মাটীতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাবা মহানের নিস্পান্দ দেহটাও একটা কটু শব্দ করে ভূলুণ্ঠিত হল।

দয়াময়ীর শ্বশুরবংশে বাতি দিতে আর কেউ রইল না।

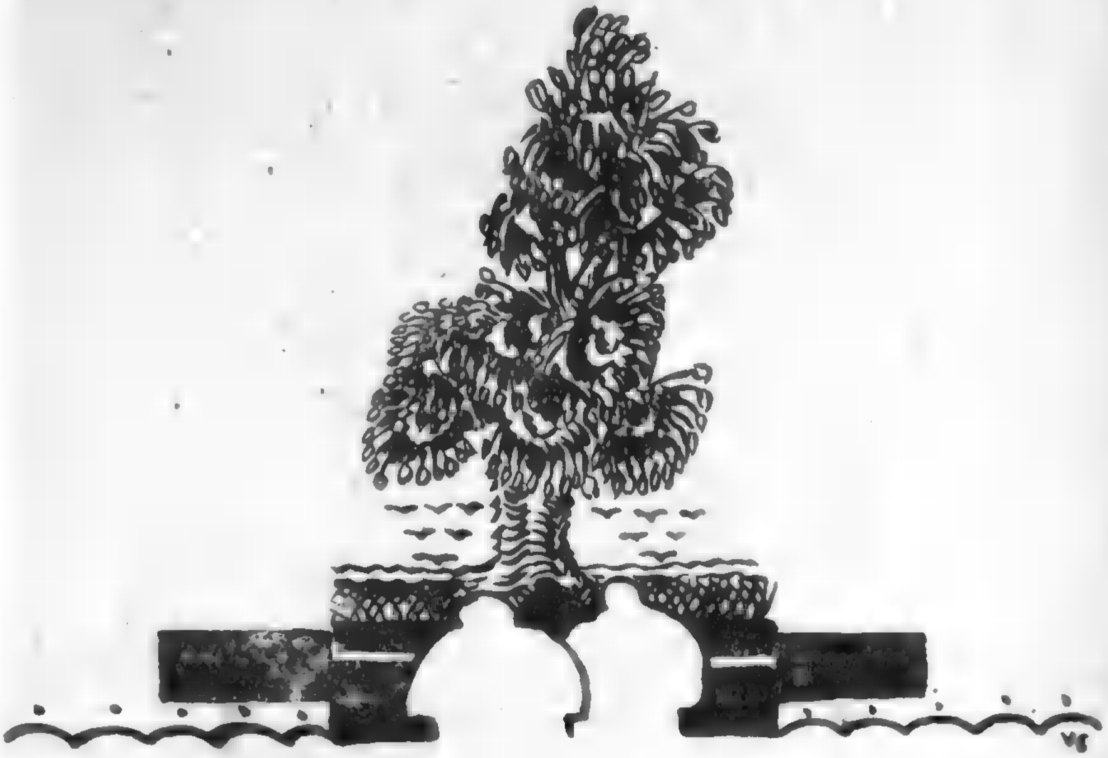

কলা-ভবন

নীলাময় বসু

শিল্পকলার গুণগ্রহণের পথে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে যে সব প্রাথমিক অবস্থা মাড়িয়ে মাড়িয়ে যেতে হয় সেগুলির প্রয়োজনীয়তা শিল্পানুরাগীদের কাছে যথেষ্ট মূল্য পায়। এমন কি, যারা শিল্পী হবার কোন বাসনাই মনে রাখে না তারাও এ বিষয়ে কিছু না কিছু জানবার ইচ্ছে রাখে —এতই চিত্র-পিপাসু মানুষের মন। যে মানুষ নিজের প্রেরণায় বিশ্বাস রাখে আর নিজে কী চায় সে জানে, তার পক্ষে শিল্পীকে এড়িয়ে তার চিত্রকলার দিকে এগিয়ে যাবার দুটো প্রধান রাস্তা আছে। একটা হচ্ছে - ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণে সে-বিষয়ে মনোনিবেশ করা, কোন যোগ্য পরিচালনায় পূর্ব্বেকার ও বর্ত্তমান শিল্পীদের গুণগ্রহণের ক্ষমতা লাভ করা গভীরভাবে চিন্তা করা এবং এই রকম করে নিজের মনে মনে একটা গুণের মূল্য নিরূপণ করতে শেখা।

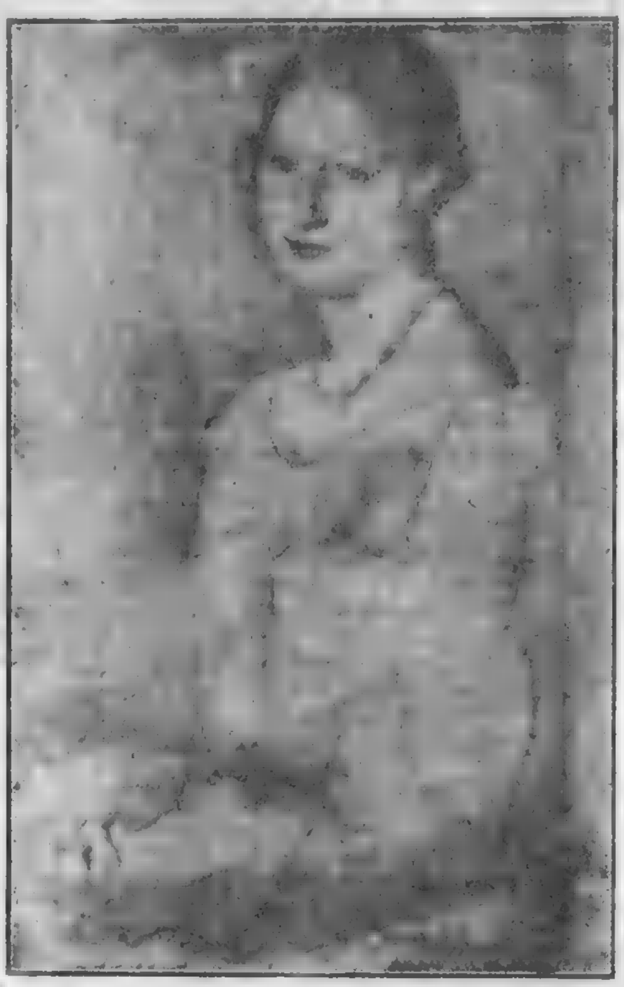

অঙ্কন আ্যালফ্রেড্ স্টিভেন্স অঙ্কিত

অপরটী হচ্ছে— কাজে কর্ম্মে শেখা, নিজের সূক্ষ্ম জ্ঞানের দ্বারা তা বিকাশ করা— যে জ্ঞান প্রকৃত শিল্পানুশীলনের দ্বারা সে অর্জ্জন করেছে।

প্রথমটা খুবই সাধারণ আর তার সুবিধেও অনেক। শেষের ব্যাপারে নিজের রুচিকে সম্পূর্ণরূপে সাধনার দ্বারা মার্জ্জিত করে তোলায় সময়ের দরকার করে। এতে কিন্তু নিজের মনের বিকাশ ঢেকে অপরের মতাদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়— আর এই নির্ভরতা আমাদের মনের গভীরতা কমিয়ে এনে ভীরুতা বাড়িয়ে দেয়, মনকে অনেক সময়ে অসৎপথে চালিত করে। অপরের গুণগ্রহণের ক্ষমতা যেন নিজের মধ্যেই সৃষ্ট হয়, নিজের-কাছে-এসে-পড়া অপরের মতামতের ওপর যেন ভর করে না দাঁড়ায়।

এই স্থানেই এসে পড়ে একটা পরিষদ গোড়ে তোলার প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশে এ সবের কোন অভাব নেই। সেখানে আমরা আমাদের অভিজ্ঞ মনের দ্বারা কথায় ও কাজে অপরের গুণগ্রহণের শিক্ষা পাই। এই পরিষদ যেন প্রথম চলা সুরু করে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি মেনে যা শিল্পীরা তাদের বহু বিভাগীয় চিত্র কলায় মেনেছে। এবং পরিষদ আপন সক্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারা আমাদের সে সব শিক্ষা দেবে। কোন রকমেই যেন পরিষদের কার্য্যক্রমের সঙ্গে শিল্প বিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মিল না ঘটে। এর কাজ যেন শিল্পী তৈরী করা না হয় বরং অপরের সৃষ্ট শক্তির প্রতি সজাগ শ্রদ্ধা আনিয়ে দেয় আর তার গুণগ্রহণে সভ্যদের সাহায্য করে। এইভাবে নিজেদের মধ্যে শিল্প চর্চ্চায় অপরের চিত্রে তাদের কৌশলী মনে পরিচয় লাভ ঘটে। তাদের চিত্র নিয়ে এই রকমের আলোচনায় শিল্পীদের সৃজনক্ষম মনের সঙ্গে সত্যিকারের যেন সংস্পর্শ ঘটে। এইভাবে শিল্পীর গুণের মর্য্যাদা দিতে দিতে নিজের মনের ঘনিয়ে ওঠা শিল্পবোধের প্রসারণ আসে আর ক্রমে ক্রমে আত্ম প্রকাশের একটা চাহিদা জন্মায়।

ওরা ত বোঝে না তুলি আর রং
কী কঠিন বশ করা—
আমাদের কাজ ওরা ভাবে মস্‌করা।

গুরুদেব

রেবা রায়

আমার নিত্যপূজার পুরোহিত তুমি যে ছিলে হে রবীন্দ্রনাথ!

গভীর প্রেরণায়, তুমি গানে, কবিতায় সাজালে এ বিশ্ব, যেন এক বিপুল পূজামণ্ডপে।

মুক্ত আলোকে ও বাতাসে, অসীমের সুখী ঝরণায়, রসমধুধারায় স্নাত হোয়ে, আনন্দময় আসনে বসে, পূজা করলে চির-সুন্দরের।

সেই সাধনার চরম-স্তর—মাধুর্য্যরস, বিলিয়ে দিলে হেথায় অকাতরে।

আকাশের পর আকাশ, মেঘের পর মেঘ, বৃষ্টির পর বৃষ্টি ভোগ করতে করতে, আমার মন যেন কোন্ বরফ-গুহায় ছিল জমে। তোমার ভাবের দোলায় আনন্দিত হয়ে—সে মন লুটিয়ে পড়লো তোমার গানের তালে,—গণ্ডীবদ্ধ সীমা ছাড়িয়ে, মুক্ত আকাশ তলায়। এক স্বচ্ছ, সবলচেতনা তোমার সুরের আলোড়নে এসে তোমায় দিল নব শক্তি! অপূর্ব্ব অনুভূতিতে মন দেহের সাথে উড়ে উড়ে, আনন্দ হিল্লোলে হল মুগ্ধ।

তোমার ঋতু উৎসব পূজায়, আমার প্রথম প্রকাশ্যে নৃত্য।

"যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে" গানের সঙ্গে তোমার বসন্তবঁধুর রূপ যেন ছন্দময়ী হোয়ে প্রকাশিত হোল গোপনে এ অন্তরে!

আজ বুঝি সেই বঁধুর চির সহচর হোয়ে নব বিকাশে ব্রতী হোলে?

এই নৃত্য-মন্দির প্রাঙ্গণে, হে পূজারী, যেদিন এনেছিলাম আমার প্রথম ফুল উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অর্ঘ্য দিতে—তুমি তো জান, এ ঘটনাস্রোতের ওপর জনতা জাগালে বিপ্লব।

কেউ এল ডাইনে,—কেউ বা রইলো বামে—কেউ এল কোদাল-কুড়াল লয়ে, কেউ বা এল শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে! কেউ বল্লে—"সমাজ হয় ওলোট-পালোট", কেউ বা বল্লে—"হাত-পা বাঁধা সইবো না আর!"

এই মত্ত-ঝড়ের দোলায় তোমার লক্ষ্যমুখী কিরণ আবেগকে দিল আরও তরঙ্গিত কোরে। আজ যাহা স্তরে স্তরে বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় আত্মজাগরণী সুধার গতিতে জনতার বুকে ঢেউ তুলেছে।

হে নৃত্য-পূজা-গুরু ! তোমার 'রস-সৃষ্টির উদ্দীপনা ছড়িয়ে নৃত্য-শিল্প ভূমি আজ উর্ব্বর।

আজ তার তালের ধারা হোল সবার খেলার সাথী, হোল ক্লান্তির শান্তি, হোল প্রেমে আনন্দ, হোল বেদনার সহানুভূতি !

মনে পরে, তুমি প্রথম যেদিন আমার নৃত্য চাইলে দেখতে, তোমার যোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'-য় !

রক্ত-সন্ধ্যায় যেমন আকাশে ঝড়ের ডাক শোনা যায়—আমার প্রাণ গেল কেঁপে। মনে হোল ভীড়ের এক ফাঁকে মিশে যাই— নিজের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকতে।

কিন্তু হে গুরু ! তোমার প্রভাব যে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী ! সেই প্রভাবে আমরা অল্প-বিস্তর সকলেই আচ্ছন্ন ! —তাই আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নি।

তুমি নৃত্য দর্শনে গেয়ে উঠেছিলে—

"মধু নিশি পূর্ণিমার
ফিরে আসে বারবার—
সেজন ফেরে না আর—
যে গেছে চলে—
বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে
এখন ফেরাবি তারে কেমনে, ছলে ?"

আজ সেই কথাই মনে হয় কবি ! —কত রাখী পূর্ণিমাই আসবে। কোন ক্ষমতাই দিয়ে যাও নি তোমায় ফেরাবার ?

উর্দ্ধে উদার নীলাকাশে—প্রতি মেঘের টুকরা যে তোমারই প্রাণের প্রাচুর্য্য রসে ভরা !

ওগো মরমী বন্ধু ! প্রতি প্রভাতে, প্রতি দিন, প্রতি সন্ধ্যায় সেথা হোতে—সরস রসিকতার স্নিগ্ধ রশ্মিতে, আর কি তোমার বাণী ঝরবে না ?

তোমার প্রাণের স্পন্দিত ভৈরব—দুর্জ্জয় আহ্বান-ধ্বনি শুনবো না কি ঐ বজ্র মেঘের ডাকে ? জমাট মেঘে বর্ষার জল থৈ থৈ তালে হৃদয় ময়ূরকে কি আর নাচিয়ে দেবে না ?

ফলে ফুলে রঙ্গের ছটায়, তোমার হাসির ঘটা কি আর দেখ্‌বো না ?

প্রকৃতি মাঝেই তোমার স্বাভাবিক প্রকাশ যে কবি। প্রকৃতির দেহে রজনীর

অন্ধকারেও তোমার ছন্দ তড়িৎ গভীর হতে গভীরতম দেশ ঘুরে ঘুরে—খুলে দেয় অপরূপ মধুময় চিতস্বরূপ রূপ !

আজ কেবলি মনে হয়—এই স্বর্গীয় ভাব- মাধুর্য্য রসের গঙ্গা যে বইয়ে দিলে বাংলার বুকে, —এ ধারার কি শেষ আছে ? কে পারে গঙ্গার স্রোত ফিরিয়ে দিতে গঙ্গোত্রীর দিকে ?

তুমি অসীমকে উপলব্ধি করে,—তার নিগূঢ় মর্ম্ম রহস্য ঢেলে দিলে নানা ধারায়। একটী ধারায় নৃত্যপূজারীদের আহ্বান করে তাদের হাতে দিলে প্রদীপ, পায়ে দিলে নূপুর, দেহে দিলে ছন্দ ; —বল্লে তাদের, "বিশ্বের আনন্দকে মূর্ত্তি দাও তোমরা, —প্রাণের সৌন্দর্য্যকে কর বিকাশ – চিরসুন্দরকে ঘিরে চল তোমরা নানা ভঙ্গীমায় ।"

তোমার এই ডাক শুনে একদিন হৃদয় হয়েছিল অভিভূত। তোমার কৃপা দৃষ্টির আড়ালে নৃত্যের কত বিচিত্র রসের আস্বাদন পেয়েছি—সে যে কত বড় অধিকার দিয়েছিলে হে গুরুদেব—আজ হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি কি ভাবে তোমায় নিবেদন কোরবো বুঝতে পারছি না।

তোমার সৃজনীশক্তির প্রেরণায়, আত্মপ্রকাশের পথ হোয়েছিল দীপ্ত।

আজ আরও মহৎ লক্ষ্যের প্রেরণায়—ঐ অদৃশ্য আলোকের ছটায়—প্রতি ভঙ্গীতে যেন পূজার সৌরভ আরও ছড়িয়ে যায়— সেই আশীর্ব্বাদ অমৃতের মত বর্ষণ কর, হে গুরুদেব ॥

আমার জীবন

(শেষখণ্ড)

গোপাল ভৌমিক

৯

তারপর প্রায়ই আমাদের দেখা হ'ত—কখনও কখনও দিনে দুইবারও দেখা হ'ত। প্রায় প্রত্যেক দিনই মধ্যাহ্ন ভোজের পরে সে (ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌না) গাড়ী করে সমাধিস্থান পর্যন্ত আস্‌ত এবং যতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করত ততক্ষণ ক্রুশ ও সমাধিস্তম্ভের প্রতিলিপি পাঠ করত। কখনও কখনও গির্জার ভিতরে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাজ দেখ্‌ত। সমাধিস্থানের নিস্তব্ধতা, চিত্রকর এবং গিল্টিকারদের সরল পরিশ্রম, র‍্যাডিশের সুবুদ্ধি, বাইরের দিক থেকে আমি অন্যান্য শ্রমিকদের থেকে ভিন্ন নই—আমি যে তাদেরই মত ওয়েস্টকোট এবং পুরাণো জুতো প'রে কাজ করি এবং তারা যে আমাকে বন্ধুর মতই সম্বোধন করে—এসব তার কাছে নতুন ঠেক্‌ত এবং তার হৃদয় স্পর্শ করত। একবার তার সামনে একজন চিত্রকর যে ছাদের উপরে দরজার কাজ করছিল, আমায় ডেকে ব'লেছিল : "মিসেল্‌, আমাকে শাদা সীসে এনে দাও।"

আমি তাকে শাদা সীসে দিয়েছিলাম এবং যখন আমি ভারার উপর থেকে নেমে আস্‌ছিলাম—তার চোখে জল এসে প'ড়েছিল—সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

"তুমি কি চমৎকার লোক!" সে (ম্যারিয়া) বল্‌ল।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একটি বড় লোকের বাড়ীর খাঁচা থেকে একটি সবুজ টিয়া পাখী উড়ে গিয়েছিল এবং একমাস ধ'রে গৃহহীন একাকী সহরের এ বাগান থেকে ও বাগানে উড়ে বেড়িয়েছিল—এ ঘটনা আমার মনে আছে। ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌নাকে দেখ্‌লে আমার সেই পাখীটার কথা মনে পড়্‌ত।

"সমাধিস্থান ছাড়া!" সে হেসে বল্‌ল, "আমার আর যাবার জায়গা নেই। সহরে বিরক্তিতে আমার কান্না আসে। লোকে অ্যাজোগুইনদের বাড়ীতে পড়ে, গান করে এবং হাসে কিন্তু আমি সম্প্রতি তাদের সহ্য করতে পারি না। তোমার বোন লাজুক—কুমারী ব্লাগোভো কি কারণে যেন আমাকে ঘৃণা করেন। আমার থিয়েটার ভাল লাগে না। আমি নিজেকে নিয়ে কি করি?"

যখন তার বাড়ীতে গেলাম আমার গায়ে রঙ্ আর তার্পিনের গন্ধ—আমার হাত ময়লা। সে এটা ভালবাসত। আমি সাধারণ কাজের পোষাক প'রে তার বাড়ীতে যাই এটা সে চাইত; কিন্তু তার বৈঠকখানায় সাধারণ কাজের পোষাক প'রে আমার যেন কেমন অদ্ভুত ঠেক্‌ত—মনে হ'ত যেন সৈন্যদলের পোষাক প'রে আছি। কাজেই আমি সর্বদা নতুন সার্জের পোষাকটা প'রে যেতাম। সে এটা ভালবাসত না।

"তোমাকে স্বীকার কর্‌তে হ'বে" সে একদিন বল্‌ল, "যে তুমি তোমার নতুন ভূমিকায় অভ্যস্ত হও নি'। শ্রমিকের পোষাক প'রে তুমি বিব্রত হও—তোমার অদ্ভুত লাগে। আমাকে বলতো, তুমি নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত নও এবং তুমি অসন্তুষ্ট এইটাই কি তার কারণ নয়? তোমার এই গৃহচিত্রকার্য যেটা তুমি নিজে বেছে নিয়েছ—প্রকৃতই কি এ কাজ তোমায় তৃপ্তি দেয়?" সে উৎকণ্ঠ কণ্ঠে প্রশ্ন করল। "আমি জানি চিত্রকার্য জিনিসকে সুন্দর করে এবং দীর্ঘায়ু করে কিন্তু সে সব জিনিস ত ধনীদের এবং সে সব বিলাসের উপকরণ। তা ছাড়া তুমি অনেকবার ব'লেছ যে নিজের হাতে প্রত্যেকের জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করা উচিত—তুমি অর্থোপার্জন কর, রুটি নয়। তুমি যা' বল তার প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী কাজ কর না কেন? তোমার রুটি উপার্জন করা উচিত—প্রকৃত রুটি; তোমার চাষ করা, বীজ বপন করা, শস্য কাটা, শস্য মর্দন করা উচিত—অন্ততপক্ষে কৃষিকার্যের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ যোগ আছে এমন কিছু করা উচিত যেমন ধর গরু পোষা, মাটি খোঁড়া কিংবা বাড়ী তৈয়ারী করা......" সে টেবিলের কাছে রক্ষিত একটা সুন্দর পুস্তকাধার খুলে' বলল: "তোমাকে এসব বলছি কারণ তোমাকে আমার গোপন কথা বলব। সত্যি! এটি আমার কৃষিবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকের আধার! এর মধ্যে আবাদের উপযোগী জমি, শাকসবজী, বাগান, ফলের বাগান, পশুপালন, মৌমাছির চাষ সম্বন্ধীয় সব বই আছে: আমি সাগ্রহে এগুলি পাঠ করি এবং প্রত্যেকটির অভিমত সম্পূর্ণভাবে প'ড়েছি। মার্চ মাসের আরম্ভে ডুবেক্‌নিয়ায় যাবার স্বপ্ন আমি দেখি। সেখানে বাস করা নিশ্চয়ই অদ্ভুত—বিস্ময়জনক: নয় কি? প্রথম বছর আমি কাজ শিখব—অভ্যাস করব এবং দ্বিতীয় বছর নিজের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে সম্পূর্ণভাবে কাজ সুরু করব। বাবা আমাকে উপহারস্বরূপ ডুবেকনিয়া দিতে চেয়েছেন—আমি এটাকে নিয়ে যা' খুসী করতে পারি।"

বলতে বলতে সে লজ্জা পেল হাসি এবং অশ্রুতে মিশিয়ে সে ডুবেক্‌নিয়ার ধ্যানমগ্ন স্বপ্নজীবনের কথা জোরে বলতে লাগ্‌ল। আমি তাকে ঈর্ষা করতে লাগ্‌লাম। শীঘ্রই মার্চ আসবে। দিন বড় হচ্ছিল এবং উজ্জ্বল রৌদ্রোদ্ভাসিত অপরাহ্ণে ছাদ থেকে বরফ পড়্‌ছিল। বাতাসে বাতাসে বসন্তের গন্ধ। আমারও পল্লীতে যাবার প্রবল ইচ্ছা

দেখা দিল। যখন সে বল্‌ল যে সে ডুবেক্‌নিয়ায় বাস করতে যাচ্ছে তখন আমি যে সহরে একা প'ড়ে থাকব এটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লাম এবং তার কৃষিকার্য বিষয়ক পুস্তকের আধারটির প্রতি আমার ঈর্ষা হ'ল। আমি কৃষিকার্য বিষয়ে কিছু জান্‌তাম না আর জান্‌বার আগ্রহও ছিল না; আমি তাঁকে বল্‌তে যাচ্ছিলাম যে কৃষিকার্য হ'চ্ছে ক্রীতদাসের কাজ ত' কিন্তু সেই মুহূর্তে একবার এইরকম একটা কিছু ব'লেছিলেন মনে প'ড়ে যাওয়াতে আমি থেমে গেলাম।

লেন্ট শুরু হ'ল। এঞ্জিনিয়ার ভিক্টর আইভ্যানিশ্‌ পিটার্সবার্গ্‌ থেকে বাড়ী এলেন। আমি তাঁর অস্তিত্বের কথা ভুল্‌তে শুরু করছিলাম। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে এলেন—আসার আগে একটা টেলিগ্রামও করেন নি'। আমি যখন নিয়মিতভাবে সন্ধ্যার সময় সেখানে গিয়ে হাজির হ'লাম তখন তিনি স্নান সেরে বৈঠকখানায় পায়চারী করছিলেন। তিনি কথা বল্‌ছিলেন—তাঁর চুল কাটা তাঁকে দশবছর ছোট ব'লে মনে হ'চ্ছিল। তাঁর কন্যা বাক্সের কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে বাক্স থেকে বোতল বই প্রভৃতি বার ক'রে চাকর প্যাভেলের হাতে দিচ্ছিল। এঞ্জিনিয়ারকে দেখে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে গেলাম—তিনি দুই হাত বাড়িয়ে হাস্‌ছিলেন—তাঁর বলবান শাদা কোচ্‌ম্যানের মত দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল।

"সে এসেছে! সে এসেছে! মিঃ গৃহচিত্রকর তোমাকে দেখে আমি খুব খুসী হ'লাম! ম্যারিয়া তোমার সম্বন্ধে সব কিছু আমাকে বলেছে এবং তোমার গুণগান ক'রেছে যথেষ্ট। আমি তোমাকে বুঝতে পেরেছি এবং তোমাকে সমর্থন করি!" তিনি আমার হাত ধ'রে ব'লে চল্‌লেন: "স্টেটের কাগজ নষ্ট করা এবং চাকরার চিহ্নস্বরূপ টুপিতে ফিতা পরার চেয়ে শ্রমিক হওয়া ঢের বেশী সাধু, এবং বুদ্ধিমানের মত কাজ। আমি নিজে হাতে বেল্‌জিয়ামে কাজ ক'রেছি। পাঁচ বছর ধরে আমি এঞ্জিন চালকের কাজ ক'রেছি……'

তাঁর পরণে ছোট জ্যাকেট ছিল—পায়ে ছিল আরামদায়ক শ্লিপার—তিনি বাতের রোগীর মত হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন—হাত দোলাচ্ছিলেন হাত ঘস্‌ছিলেন; বাড়ীতে ফিরে আবার সেই প্রিয় স্নানের ঘরের সংস্পর্শে আসায় তিনি আনন্দে গুণ গুণ ক'রে গান গাইছিলেন—কাঁধ নাড়্‌ছিলেন।

তিনি নৈশভোজের সময় বল্‌লেন: "এটা অনস্বীকার্য যে তোমরা সদয় সহানুভূতিশীল লোক, কিন্তু যখনই তোমরা ভদ্রলোকরা কায়িক পরিশ্রম সুরু কর কিংবা কৃষকদের সাহায্য করতে চাও তখনই তোমরা গোঁড়ামি দেখাও। তুমি গোঁড়া—তুমি ভড্‌কা খাও না। এটা গোঁড়ামি ছাড়া আর কি?"

তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি শুড়্কা খেলাম। আমি মদও খেলাম। আমরা ছানা, সসেজ্, প্যাষ্ট্রিজ্ পিক্‌ল এবং সব রকমের ভাল খাবার খেলাম—এঞ্জিনিয়ার এসব সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন; তাঁর অনুপস্থিতির সময় বিদেশ থেকে প্রেরিত মদের নমুনাও আমরা আস্বাদ ক'রে দেখলাম। চমৎকার সব নমুনা। কোন কারণে, এঞ্জিনিয়ারের মদ এবং সিগার বিনা শুল্কে বিদেশ থেকে আস্‌ত; বিনা মূল্যে কে একজন তাঁকে বৃহৎ বৃহৎ সুখাদ্য মাছ পাঠাত; তিনি তাঁর বাড়ীভাড়া দিতেন না কারণ তাঁর গৃহস্বামী রেল্‌ওয়ের কেরোসিন্ তৈল সরবরাহ করতেন এবং সাধারণতঃ তাঁর এবং তাঁর মেয়ের কথায় মনে হ'ত যে পৃথিবীর সব কিছু উত্তম জিনিষ তাঁরা বিনা মূল্যে উপভোগ কর্‌তেন।

তাঁদের ওখানে আমি নিয়মিত যেতে লাগলাম কিন্তু আগের মত আনন্দ আর পেতাম না। এঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতি আমার কাছে কষ্টদায়ক হ'ত—তাঁর সামনে আমি কেমন মুষড়ে যেতাম। তাঁর পরিষ্কার নির্দোষ চোখের দৃষ্টি আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌তাম না; আগে এই লাল আহারপুষ্ট লোকটার অধীনে কাজ কর্‌তাম এবং তিনি যে আমার সঙ্গে নির্মম অভদ্র ব্যবহার ক'রেছেন একথা মনে করে আমার কষ্ট হ'ত। একথা সত্য যে তিনি আমার কোমর জড়িয়ে আমার ঘাড়ে সদয়ভাবে চাপড় দিয়ে আমার জীবনযাত্রা প্রণালী সমর্থন কর্‌তেন কিন্তু তিনি যে আগের মতই আমার নিষ্ফলতাকে ঘৃণা কর্‌তেন একথা আমি বুঝতাম তিনি শুধু মেয়েকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমাকে সহ্য কর্‌তেন। আমি সহজভাবে হাস্‌তে এবং কথা বল্‌তে পার্‌তাম না—নিজেকে আমার অভদ্র ব'লে মনে হ'ত—সব সময় আমি উদ্‌গ্রীব থাক্‌তাম কখন তিনি তাঁর চাকর প্যাভেলের মত আমাকেও প্যাণ্টেলে বলে ডাকেন। প্রাদেশিক শ্রমিকের গর্ব আমার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। সহরের লোক যাঁদের বিদেশী ব'লে মনে করে সেই ধনী অপরিচিতের বাড়ীতে আমি, একজন শ্রমিক,—একজন সামান্য গৃহচিত্রকর—রোজ যাই আর তাঁদের দামী দামী বিদেশী খাবার খাই! আমি বিবেকের সঙ্গে এটাকে খাপ খাওয়াতে পারলাম না। আমি যখন ওঁদের বাড়ী যেতাম তখন পথে কারও সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে কঠিন ভাবে এড়িয়ে যেতাম এবং গোঁড়ার মত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতাম; যখন এঞ্জিনিয়ারের বাড়ী থেকে বেরুতাম তখন এত খাওয়ার জন্য লজ্জিত হ'তাম।

কিন্তু প্রধানত আমার প্রেমে পড়বার ভয়ই হ'য়েছিল বেশী। রাস্তায় বেড়াতে, কাজ করতে, বন্ধুদের সঙ্গে কথা বল্‌তে আমার সর্বদা মনে পড়ত সন্ধ্যাবেলা কখন ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌নার বাড়ী যাব; তার স্বর, তার হাসি, তার গতিভঙ্গী সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। তার বাড়ীতে যাওয়ার আগে আমি ভাঙা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে অতি

যত্নে নেকটাই বাঁধতাম : সার্জের পোষাকটা আমার ভয়ংকর ব'লে মনে হ'ত—আমি কষ্ট পেতাম কিন্তু নিজেকে ছোট মনে হওয়ায় আমি আবার নিজেকে ঘৃণা করতাম। সে যখন অন্য ঘর থেকে আমাকে ডেকে বল্‌ত যে তার পোষাক পরা হয় নি' এবং আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বল্‌ত আমি তখন তার পোষাক পরার শব্দ শুনে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌তাম—মনে হ'ত যে আমার পায়ের নীচে মেঝে বুঝি ডুবে' যাচ্ছে। আমি রাস্তায় কিছু দূরেও কোন মেয়েকে দেখ্‌লে তার চেহারার সঙ্গে তুলনা করতাম—তার তুলনায় সহরের অন্যান্য মহিলা এবং মেয়েদের অতি সাধারণ ব'লে মনে হ'ত—তাদের পরণে বিশ্রী পোষাক আর তারা কেউ ভদ্র ব্যবহার জানে না ; এরকম তুলনায় আমার মনে গর্বের সৃষ্টি হ'ত ; ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌না এদের সবাইর চেয়ে ভাল। রাত্রিতে আমি তার এবং আমার স্বপ্ন দেখ্‌তাম।

একদিন নৈশভোজে এঞ্জিনিয়ার এবং আমি একটা গোটা গল্‌দা চিংড়ি খেয়ে ফেল্‌লাম। বাড়ী ফিরে আমার মনে পড়্‌ল যে এঞ্জিনিয়ার দুইবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমাকে 'প্রিয় ছোকরা" ব'লে সম্বোধন ক'রেছিলেন ; আমার মনে হ'ল যে একটা প্রভুহীন বড় অসুখী কুকুরের মতই তাঁরা আমাকে মনে করেন—তাঁরা আমাকে নিয়ে শুধু আমোদ করছিলেন—যখন বিরক্ত হ'য়ে যাবেন তখন একটা কুকুরের মতই তাঁরা আমায় তাড়িয়ে দেবেন। নিজেকে লজ্জিত এবং আহত ব'লে মনে হ'ল ; অপমানিত হ'য়েছি মনে করে আমার প্রায় কান্না পেল এবং আকাশের দিকে চোখ তুলে প্রতিজ্ঞা করলাম যে এসব শেষ করতে হবে।

পরের দিন ডলঝিকভ্‌দের বাড়ী গেলাম না। অনেক রাত্রে আমি জানালার দিকে চেয়ে গ্রেট্‌জেন্ট্রি ষ্ট্রীট্‌ দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছিলাম—তখন গভীর অন্ধকার, বৃষ্টিও পড়্‌ছিল। অ্যাঝোগুইন্‌দের বাড়ীতে সবাই ঘুমিয়ে প'ড়েছিল—উপরের জানালায় একটা মাত্র আলো জ্বল্‌ছিল; বুড়ী মিসেস্‌ অ্যাঝোগুইন্‌ মোমবাতির সাম্‌নে ব'সে সেলাই করছিলেন আর ভাবছিলেন যে তিনি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। আমাদের বাড়ীতে এবং বিপরীত দিকে ডল্‌ঝিকভ্‌দের বাড়ীতে অন্ধকার—জানালাগুলোয় বাতি ছিল কিন্তু ফুল এবং পর্দার মধ্য দিয়ে কিছু দেখ্‌বার উপায় ছিল না। আমি রাস্তার এদিক থেকে ওদিক অবধি বেড়াতে লাগ্‌লাম ; ঠাণ্ডা মার্চ মাসের বৃষ্টিতে আমি একেবারে ভিজে গেলাম। ক্লাব থেকে বাবা বাড়ী ফিরলেন—আমি দরজায় তাঁর করাঘাত শুন্‌তে পেলাম ; মুহূর্ত্তে একটা জানালার বাতি দেখা গেল আমার বোনকে ঘন চুল বিন্যাস করতে করতে তাড়াতাড়ি বাতি হাতে নামতে দেখ্‌লাম। তারপর বৈঠকখানায় কথা বল্‌তে বল্‌তে এবং হাত ঘস্‌তে ঘস্‌তে বাবা ঘুরতে লাগ্‌লেন—আমার বোন তাঁর কথায় কর্ণপাত না ক'রে নিজের চিন্তায় ডুবে একপাশে ব'সে থাক্‌ল।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা এ ঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন এবং বাতিটাও নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। অন্ধকারে এবং বৃষ্টিতে নিজেকে অস্বাভাবিক রকম একলা মনে হ'ল—আমি যেন প্রকৃতির কাছে কৃপাপ্রার্থী ; আমার প্রকৃত এবং ভাবী একাকিত্ব এবং যন্ত্রণার কাছে আমার সমস্ত কাজ, সমস্ত কামনা এবং এ পর্যন্ত যা' ভেবেছি এবং প'ড়েছি সে সমস্তই ব্যর্থ ব'লে মনে হ'ল। হায়, মানুষের কাজ এবং চিন্তা তার দুঃখের তুলনায় কিছুই নয়। আমি কি করছি না জেনেই আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে ডল্‌ঝিকভ্‌দের দরজার 'বেল্‌'টা টেনে ভাঙ্‌লাম—তারপর ছোট ছেলের মত দৌড়াতে লাগ্‌লাম—মনে ভয় ছিল পাছে তাঁরা বেরিয়ে এসে আমায় চিন্‌তে পারেন। পথের প্রান্তে যখন নিঃশ্বাস নেবার জন্য থামলাম তখন শুন্‌তে পেলাম শুধু বৃষ্টির শব্দ এবং দূরে একটি লোহার পাতের উপর পাহারাওয়ালার আঘাতের শব্দ।

পুরো এক সপ্তাহ ডলঝিকভ্‌দের বাড়ী গেলাম না। আমি সার্জের পোষাকটা বিক্রয় করলাম। হাতে কাজ ছিল না আবার অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো ; কখনও কখনও অপ্রীতিকর কোন কাজ ক'রে দিনে দশ থেকে বিশ কোপেক্ পর্যন্ত রোজগার করতাম। কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে আমি আমার স্মৃতি ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম—এঞ্জিনিয়ারের বাড়ীতে যত ছানা আর ভাল ভাল খাবার খেয়েছি তার জন্য নিজেকে শাস্তি দেবার চেষ্টা করতাম। তবু ভিজে এবং ক্ষুধিত অবস্থায় বিছানায় শুলেই আমার বন্য কল্পনা চমৎকার মনোহারী সব ছবি আঁকা সুরু করত ; বিস্মিত হ'য়ে স্বীকার করতাম যে আমি প্রেমে প'ড়েছি—ভীষণভাবে প্রেমে প'ড়েছি—তারপর গাঢ় ঘুম আসত, অনুভব করতাম যে কঠিন কাজ শুধু আমার দেহকে আরও বেশী বলবান এবং সতেজ ক'রেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অসময়ে তুষারপাত শুরু হ'ল—উত্তর দিক থেকে বাতাস বইতে লাগ্‌ল যেন শীতকাল শুরু হ'য়ে গেছে। কাজ শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে দেখি যে ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌না আমার ঘরে ব'সে আছে। তার গায়ে ফারকোট ছিল—মাফ্‌লারের মধ্যে তার হাতদুটি ঢোকানো।

"তুমি আমাকে দেখ্‌তে যাওনা কেন?" তার উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল। আমি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেলাম—আমি কঠিন ভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম—আমাকে মারবার আগে বাবার সাম্‌নে ঠিক যেমন ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম ; সে সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল এবং আমি তার চোখ দেখে বুঝ্‌লাম যে আমি যেন অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছি তা' সে বুঝেছে।

"তুমি কেন আমায় দেখ্‌তে যাও না?" সে পুনরাবৃত্তি করল। "তুমি যেতে

চাও না ? আমাকেই তোমার কাছে আস্‌তে হ'ল ।"

সে উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে এল।

"আমাকে ছেড়ে যেও না" সে বল্‌লে— তার চোখ দুটি জলে ভরা। "আমি একা, সম্পূর্ণ একা !"

সে কাঁদ্‌তে শুরু করল এবং মাফ্‌লার দিয়ে মুখ ঢেকে বল্‌ল "একা! জীবন বড় কঠিন—বড় কঠিন এবং সারা জগতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই ! আমাকে ছেড়ে যেও না !"

চোখের জল মোছার জন্য রুমাল খুঁজতে গিয়ে সে হেসে দিল ; কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে নীরব রইলাম - তারপর তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে আমি চুমু খেলাম, তার টুপির পিনে আঁচড় লেগে আমার মুখ থেকে রক্ত বেরুলো।

তারপর আমরা কথা বল্‌তে লাগ্‌লাম যেন আমরা পরস্পরের কত দিনের ভালবাসার ধন !

১০

দিন দুয়েকের মধ্যে সে আমায় ডুবেক্‌নিয়ায় পাঠিয়ে দিল এবং এতে আমার যে আনন্দ হ'ল তা' ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি হেঁটে স্টেশনে যেতে যেতে এবং ট্রেণে ব'সে বিনা কারণে হাস্‌তে লাগ্‌লাম —লোকেরা আমায় মাতাল মনে করলে। তখনও সকাল বেলায় কুয়াশা এবং তুষারপাত হ'ত ; কিন্তু রাস্তাগুলো অন্ধকার হচ্ছিল এবং পথের পরে অনেক কাক ডাক্‌ছিল।

প্রথমে ভেবেছিলাম যে মিসেস্ শেপ্রাকভের বিপরীত দিকের কক্ষটায় আমার এবং ম্যারিয়ার জন্য ব্যবস্থা করব, কিন্তু দেখা গেল যে ঘুঘুপাখী এবং পায়রা সে ঘরে বাসা বেঁধেছে—ফলে অনেকগুলি বাসা ধ্বংস না করলে ও-ঘর পরিষ্কার করা অসম্ভব ব'লে মনে হ'ল। আমরা চাই আর না চাই আমাদের বড় বাড়ীটার ভেনিসের মত খড়খড়ি দেওয়া ঘরগুলোতেই বাস করতে হ'বে। চাষারা এই বাড়ীটাকে রাজপ্রাসাদ বল্‌ত ; বাড়ীটায় বিশটার বেশী ঘর ছিল আর আসবাব বল্‌তে চিলে কোঠায় শুধু একটা পিয়ানো আর এক খানা ছোট ছেলের চেয়ার ছিল ; ম্যারিয়া যদি সহর থেকে তার সমস্ত আসবাবও নিয়ে আসে তবু আমরা বাড়ীটার কঠিন শূন্যতা এবং প্রতিকূলতা দূর করতে পারব না। আমি বাগানের দিকে জানালাওয়ালা তিনটে ঘর বেছে নিলাম এবং সকাল থেকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই ঘরগুলির পিছনে আমায় খাট্‌তে হ'ল—জানালাগুলো চক্‌চকে করলাম, দেওয়ালে কাগজ লাগালাম—মেঝের গর্ত্তগুলো বন্ধ করলাম। কাজটা বেশ সহজ এবং আরামদায়ক ছিল। মাঝে মাঝেই বরফ জমছে কি না দেখার জন্য নদীর পারে দৌড়িয়ে

যেতাম এবং মনে মনে স্ট্যালিং পাখীদের ফিরে' আসার কথা ভাব্তাম। রাত্রিতে যখন ম্যারিয়ার কথা ভাব্তাম তখন সীলিংয়ের উপর ইঁদুর আর বাতাসের শব্দ শুন্তে শুন্তে একটা সর্বব্যাপী আনন্দের অবর্ণনীয় মধুর ভাবে আমার হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে যেত ; মনে হ'ত বুড়ো কোন ভূত বুঝি চিলে কোঠায় কাস্‌ছে।

গভীর বরফ প'ড়েছিল ; মাসের শেষে ভয়ংকর তুষার পাত হ'ল কিন্তু শীঘ্রই যাদুমন্ত্রে যেন সে তুষার গ'লে গেল এবং বসন্তের ধারা নেমে এল ফলে এপ্রিলের প্রথমেই স্টার্লিং পাখীর ডাক শোনা গেল এবং বাগানে প্রজাপতিগুলোও ছুটোছুটি সুরু করল। প্রাকৃতিক আবহাওয়া চমৎকার হ'ল। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার দিকে মাসার সঙ্গে দেখা করার জন্য সহরের দিকে হেঁটে যেতাম : খালি পায়ে নরম শুষ্কপ্রায় পথে হাঁট্তে কি আরাম! অর্ধেক পথ যেয়ে আমি ব'সে পড়্তাম—নিকটে যাবার সাহস না পেয়ে সহরের দিকে তাকিয়ে থাক্তাম। সহরটি দেখলেই আমি বিব্রত হ'য়ে পড়তাম, আমি প্রেমে পড়েছি শুন্লে আমার পরিচিত লোকেরা কি ভাব্বে! বাবাই বা কি বল্বেন? আমি এই কথা ভেবে বিশেষ চিন্তিত হ'তাম যে আমার জীবন জটিল হ'য়ে উঠ্ছিল—জীবনের উপর কোন প্রভাবই আর আমার নেই—ভগবান জানেন আমাকে সে বেলুনের মত কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল। কি ক'রে জীবিকানির্বাহ করব সে কথা ভাবা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম এবং আমি ভেবেছিলাম—প্রকৃত পক্ষে কি যে ভেবেছিলাম মনেই পড়ে না।

মাসা গাড়ী ক'রে আস্ত। আমি তার পাশে বস্তাম এবং দুজন সুখে স্বাধীন ভাবে ডুবেক্নিয়ায় যেতাম। কিংবা সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ক্লান্তি এবং অসন্তুষ্টি নিয়ে মাসা কেন এলনা ভাব্তে ভাব্তে বাড়ী ফিরতাম এবং তারপর সদর দরজার কাছে কিংবা বাগানে আমার প্রিয়তমাকে পেতাম। সে ট্রেণ থেকে নেমে স্টেশন থেকে হেঁটে আস্ত। কি অপূর্ব বিজয়! পরণে তার শাদা পশমের পোষাক—হাতে সাধারণ দস্তানা কিন্তু তার দেহসজ্জাটি নিখুঁত পরিপাটি পায়ে দামী প্যারীর বুট্—সে প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর মত গ্রাম্য মেয়ের অভিনয় করত। আমরা সমস্ত বাড়ীটা পরিদর্শন কর্তাম—ঘর, পথ, সব্জীর বাগান এবং মৌচাকের পরিকল্পনা করতাম। এর মধ্যেই আমরা পাতিহাঁস, রাজহাঁস এবং মুরগীর বাচ্চা পুষ্ছিলাম—এগুলোকে আমরা ভালবাসতাম কারণ সেগুলো আমাদের। বপনের জন্য ওট্ গম যব এবং সজ্জার বীজ প্রস্তুত ছিল—আমরা সে বীজ পরীক্ষা কর্তাম আর মনে মনে ভাব্তাম শস্যগুলো কেমন দেখ্তে হ'বে। মাসা আমাকে যা-কিছু বল্ত তা-ই আমার কাছে অদ্ভুত বুদ্ধির পরিচায়ক এবং সুন্দর ব'লে মনে হ'ত। এইটাই ছিল আমার জীবনের সব চেয়ে সুখের সময়।

ঈস্টারের পরে পরেই ডুবেক্‌নিয়ার তিন মাইল দূরে কুরিলোভ্‌কা গ্রামের গির্জায় আমাদের বিয়ে হ'ল। মাসা সব কিছুই সহজ সরলভাবে সম্পন্ন করতে চেয়েছিল: তার ইচ্ছামত চাষার ছেলেরাই নীতবরের কাজ করল একজন মাত্র ধর্মযাজক মন্ত্র পড়্‌লেন এবং আমরা একটা ছোট কম্পমান গাড়ীতে ক'রে ফিরে এলাম—সে নিজেই গাড়ী চালিয়েছিল। সহর থেকে আমার বোনই একমাত্র অতিথি এসেছিল। বিয়ের দুদিন আগে মাসা তাকে চিঠি লিখেছিল। আমার বোন শাদা পোষাক আর শাদা দস্তানা প'রেছিল……বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় সে ভাবাবেগে এবং আনন্দে কেঁদে ফেল্‌ল, তার মুখে অসীম সততার একটা অপূর্ব মাতৃভাব! আমাদের সুখে সে পাগল হ'য়ে উঠেছিল যেন তার নিঃশ্বাসে একটা সুগন্ধ; আমি তার দিকে চেয়েই বুঝ্‌লাম যে তার কাছে প্রেম পার্থিব প্রেমের চেয়ে বড় কিছু আর নেই—সে গোপনে ভয়ে ভয়ে অথচ প্রগাঢ় প্রেমের স্বপ্ন দেখ্‌ছিল। সে মাসাকে আলিঙ্গন করল, চুমু খেল এবং কি ক'রে তার আনন্দ প্রকাশ করবে না জেনে আমার সম্বন্ধে সে তাকে বল্‌ল:

"ও খুব ভাল লোক। খুব ভাল লোক!"

চ'লে যাবার আগে সে সাধারণ পোষাক পরল এবং আমার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার জন্য আমাকে বাগানে নিয়ে গেল।

"বাবাকে তুমি কিছু লেখো নি বলে তিনি খুব আঘাত পেয়েছেন" সে বল্‌ল। "তাঁর আশীর্বাদ চাওয়া তোমার খুব উচিত ছিল। কিন্তু মনে মনে তিনি খুব খুসী হ'য়েছেন। তিনি বলেন যে এই বিবাহে সমাজের চোখে তোমার পদোন্নতি হ'বে এবং মারিয়া ভিক্টোরোভ্‌নার প্রভাবে জীবনের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন হ'বে। সন্ধ্যাবেলা এখন তোমার কথা ছাড়া আর আমাদের কোন আলোচনা হয় না; এবং গতকাল তিনি এমন কি আমাদের মিসেল্‌' পর্যন্ত ব'লেছেন। আমি খুব আনন্দিত হ'য়েছিলাম। স্পষ্টই বোধ হয় তিনি মনে মনে কোন পরিকল্পনা ক'রেছেন এবং আমার মনে হয় তিনি তোমাকে একটা উদারতার নিদর্শন দেখাতে চান—তিনি নিজেই প্রথম মিটমাটের কথা তুল্‌বেন। এটা খুবই সম্ভব যে এরই মধ্যে একদিন তিনি এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।" সে আমার উপরে একটা ক্রুশের চিহ্ন এঁকে বল্‌ল:

"বেশ, ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। সুখী হও। অ্যানিউটা ব্লাগোভো খুব চালাক মেয়ে। তোমার বিয়ে সম্বন্ধে সে বলে যে ভগবান তোমাকে একটা নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন ক'রেছেন। আচ্ছা? বিবাহিত জীবনে কেবল সুখই নেই যন্ত্রণাও আছে। যন্ত্রণার হাত এড়ানো অসম্ভব!"

মাসা এবং আমি তার সঙ্গে তিন মাইল পর্যন্ত হেঁটে গেলাম—তারপরে নিঃশব্দে শান্তভাবে বাড়ী ফিরলাম যেন এটা আমাদের দুজনের পক্ষেই বিশ্রাম। আমার হাতের মধ্যে মাসার হাত। আমাদের মনে শান্তি—প্রেমের কথা বলার আর প্রয়োজন ছিল না; বিয়ের পর আমরা পরস্পর আরও কাছে স'রে এলাম—পরস্পরের আরও প্রিয়তর হ'য়ে উঠলাম—মনে হ'ল যে কিছুই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না!

"তোমার বোন চমৎকার ভালবাসার পাত্রী" মাসা বল্‌ল "কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় যে ও যন্ত্রণার মধ্যে বাস করছে। তোমার বাবা নিশ্চয়ই ভয়ংকর লোক!"

আমার বোন এবং আমি কিরকম ভাবে মানুষ হ'য়েছিলাম এবং আমার শৈশব কিরকম অদ্ভুত যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে—এসব আমি তাকে বল্‌তে লাগলাম। যখন সে শুনল যে এই সেদিনও বাবা আমায় মেরেছেন তখন সে ভয়ে কেঁপে উঠে আমায় জড়িয়ে ধর্‌ল।

"আমার আর এসব কথা ব'লো না" সে বল্‌ল। "এ অত্যন্ত ভয়ংকর!" আর সে আমায় ছেড়ে গেল না। আমরা বড় বাড়ীটার তিনটি ঘরে বাস করতে লাগ্‌লাম—সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীটার শূন্য অংশের দিকের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতাম যেন আমরা যাকে জানি না এবং ভয় করি এমন কেউ ওখানে বাস করে। আমি খুব ভোরে উঠে কাজ সুরু কর্‌তাম। আমি গাড়ী মেরামত কর্‌তাম, বাগানে পথ তৈরী করতাম, ফুলের কেয়ারী তৈয়ারী কর্‌তাম—ছাদে রঙ্‌ লাগাতাম। উপযুক্ত সময়ে আমি লাঙ্‌ল চ'ষে, মই দিয়ে ওটের বীজ বপনের চেষ্টা কর্‌লাম -আমি বিবেকের অনুমোদনক্রমেই এসব কাজ করতাম—সব কাজ চাষীর উপর ফেলে রাখতাম না। আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌তাম—বৃষ্টিতে এবং তীক্ষ্ণ উত্তরের বাতাসে আমার মুখ এবং পা' জ্বল্‌ত। কিন্তু মাঠের কাজ আমায় আকর্ষণ কর্‌ত না।

আমি কৃষিকার্য সম্বন্ধে কিছু জান্‌তাম না এবং পছন্দও কর্‌তাম না। হয়ত আমার পূর্বপুরুষেরা চাষী ছিলেন না এবং আমার শিরায় সহরের রক্ত প্রবাহিত ছিল ব'লেই এই অবস্থা। আমি প্রকৃতিকে খুব ভালবাস্‌তাম; আমি মাঠ, ক্ষেত এবং বাগান ভালবাসতাম কিন্তু ছেঁড়া পোষাক প'রে ভিজে গায়ে ঘাড় নীচু ক'রে বেচারা ঘোড়াকে গালি দিতে দিতে যে-চাষা মাঠ চাষ কর্‌ত সে আমার কাছে একটা বর্বর রুক্ষ এবং কুৎসিত শক্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং তার বিশৃঙ্খল গতিভঙ্গী লক্ষ্য কর্‌তে কর্‌তে আমি সেই বহু প্রাচীন পৌরাণিক যুগের কথা—যে যুগে মানুষ আগুনের ব্যবহার জান্‌ত না—না ভেবে পার্‌তাম না। দলের নেতা ভয়ংকর ষাঁড় এবং গ্রামের মধ্যে ভ্রাম্যমান ঘোড়া দেখে আমি ভয় পেতাম এবং বড় বড় শক্তিশালী বিরোধী জীব—যেমন শিংওয়ালা ভেড়া, রাজহাঁস কিংবা কুকুর, তাদের কোন রুক্ষ বন্য শক্তির প্রতীক্ ব'লে মনে হ'ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যখন ঘন

মেঘ অন্ধকার চাষের জমির উপর ঝুলে' থাকত তখনই এই সব কুসংস্কার আমার মনে বিশেষ প্রবলভাবে দেখা দিত। কিন্তু সব চেয়ে বিশ্রী লাগ্‌ত যখন আমি নিজে ক্ষেত চষ্‌তাম কিংবা বীজ বপন কর্‌তাম এবং কয়েকজন কৃষক আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাজ দেখ্‌ত- তখন আর আমি কাজের অবশ্যম্ভাবিতা এবং প্রয়োজনীয়তা বোধ কর্‌তাম না, এবং আমার মনে হ'ত যে আমি মিছামিছি সময় নষ্ট করছি!

আমি বাগান এবং মাঠের মধ্য দিয়ে মিলে যেতাম। স্টায়েপান নামে কুরিলোভ্‌কার একজন কৃষক এটা ইজারা নিয়েছিল; স্টায়েপান্ সুন্দর এবং কালো দেখ্‌তে -মুখে কালো দাড়ি—বেশ ব্যায়াম করা চেহারা। সে মিলের কাজ করত না মিলের কাজকে সে ক্লান্তিকর এবং ক্ষতিকর মনে কর্‌ত, সে শুধু বাড়ীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য মিলে থাক্‌ত। সে লাগাম তৈরী কর্‌ত, সব সময়ে তার গায়ে ট্যান্ আর চামড়ার গন্ধ। সে বেশী কথা বল্‌তে ভালবাস্‌তো না সে ধীর এবং স্থিতিশীল ছিল এবং নদীর তীরে ব'সে কিংবা মিলের দরজার কাছে ব'সে 'উলুলু' ব'লে গুঞ্জন কর্‌ত। কখনও কখনও কুরিলোভ্‌কা থেকে তার বউ এবং শাশুড়ী তাকে দেখ্‌তে আস্‌ত; তারা দুজনেই সুন্দরী, বিষণ্ণ এবং নরম দেখ্‌তে—তারা বিনীত ভাবে তার কাছে মাথা নোয়াত এবং তাকে স্টায়েপ্যান্ পেট্রোভিশ বল্‌ত। সে কথা ব'লে কিংবা কোনরকম চিহ্নের দ্বারাও তাদের সম্ভাষণ ফিরিয়ে দিত না—শুধু মাত্র নদীর তীরে ব'সে ব'সেই পাশ ফিরে' শান্তভাবে গুঞ্জন করত: "উলু-লু"। এক বা দুই ঘণ্টা ধ'রে নীরবতাই থাক্‌ত। তার শাশুড়ী ও বউ নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ ক'রে কি বল্‌ত---উঠে দাঁড়িয়ে সে তাদের দিকে ফেরে কি না এই ভরসায় তার দিকে আশান্বিতভাবে তাকিয়ে থাকত এবং তারপর তারা সবিনয়ে মাথা নামিয়ে মধুর মৃদু গলায় বল্‌ত: "বিদায়, স্টায়েপ্যান পেট্রোভিশ।"

তারা চ'লে যেত। তারপর তারা তার জন্য যে বিস্কুটের পোট্‌লা কিংবা শার্ট এনেছিল সেটা সরিয়ে রেখে তাদের দিকে চেয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ত: "স্ত্রী জাতি!"

উভয় চাকার সাহায্যে দিনরাত মিলের কাজ চল্‌ত। আমি স্টায়েপ্যানকে সাহায্য করতাম—আমার ভাল লাগ্‌ত এবং তারপর সে যখন চ'লে যেত আমি তখন সানন্দ চিত্তে তার জায়গাটা দখল করতাম।

ক্রমশ

গৃহকোণ

রেখা দেবী

[এখানে মেয়েদের কথা মেয়েরা বলবেন]

এই বিভাগে, আমার প্রথম প্রবন্ধে "সবিনয়-নিবেদন" পূর্ব্বক যে চিঠিপত্র লেখার কথা পাঠিকাদের জানিয়েছিলাম তার উত্তরে 'অফিসে' যে সব চিঠিপত্র এসে পৌঁছেচে তার মধ্যে প্রায় সবগুলি থেকেই দেখা গেল যে দুটী প্রশ্ন বেশী ক'রে উঁকি দিচ্ছে। প্রথম :—কেমন করে দেহের অতিরিক্ত 'মেদ-মাংস' নাশ করে ভারমুক্ত হওয়া যায় ; দ্বিতীয় : কি ভাবে শরীরে একটু রক্ত-মাংস অর্জ্জন করে "অতিরিক্ত কৃশতার" হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। বাংলা দেশের চির-পুরাতন সমস্যা !!

এই বেশী রোগা, এবং বেশী মোটার সমস্যা এদেশের প্রায় প্রতি গৃহেই বিরাজ করছে। আর সৌভাগ্য বশতঃ যাঁরা এ দু'পর্য্যায়ের এক পর্য্যাতেও পড়েন না তাঁদের সংখ্যা আবার এত কম যে সচরাচর বড় একটা তাঁদের চোখে পড়ে না। কাজেই এই প্রশ্ন দুটীর উত্তর স্বরূপ আলোচনাই এবারের আলোচ্য বিষয় হিসাবে ধার্য্য করেছি—। এই দুটী বিপদজনক অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার পাবার পথ দেখানর ভার নিলে অনেক আশীর্ব্বাদই যে আমার শিরে বর্ষিত হবে তা আমি ভালো করেই জানি—কিন্তু কেউ কেউ যদি আবার মাত্র ১০।১৫ দিন আমার কথা মতো খাওয়া দাওয়া করেই ফল পাবার আশা করেন এবং তা না দেখতে পেলে আশীর্ব্বাদের বদলে তার উল্টো কিছু আমার উদ্দেশে বর্ষণ করতে থাকেন তাহলে আমি নাচার ! আগে থাকতেই বলে রাখা ভালো যে দুটী অবস্থাই সমান করুণ—এবং উদ্ধারের পন্থাও সমান কঠিন। কাজেই কি রোগা, কি মোটা, যাঁরা ধৈর্য্য ধরে, নিয়মিতরূপে, কিছুদিন ধরে অর্থাৎ কয়েক মাস ধরে নিয়ম পালন করতে পারবেন, এ সধানায় একমাত্র তাঁরাই সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন।

প্রথমে আমি যাঁদের রোগা হওয়া দরকার তাঁরা কি খাবেন এবং কি করবেন তার একটী সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করে দিচ্ছি,—সারা দিন ও রাত্রের মধ্যে আহার করবেন কেবল ২ বার ! সাধারণ লোকের মত চার বার খাওয়া অর্থাৎ সকালে এবং বিকেলে জলখাবার সহ চা পান একেবারেই বন্ধ—নেহাৎ যদি চায়ের নেশা অত্যাস্ত বেশী রকম থাকে তবে দু'বেলা দু'পেয়ালা চা পাতি লেবুর রস দিয়ে খাওয়া চলতে পারে, দুধ চিনি দিয়ে নয়।

আর যে দু'বেলা আহার করবেন তার মধ্যেও অনেক কিছুই বাদ দিতে হবে—যেমন, ভাত দুবেলা খাওয়া চলবে না, এক বেলা অল্প করে দুটী ভাত ও অত্যন্ত হাল্কা রান্না, যাতে ঘি তেল বা মশলা থাকবে না—আর একবেলা কয়েক খানা রুটী—সুজী বা আটার রুটী কিন্তু তাতে ঘি মাখানো চলবে না—এছাড়া যে সব খাবার কথা একেবারেই ভুলতে হবে তারও একটী লম্বা ফর্দ্দ আছে—মাখন, চিনি, গুড়, দুধ, কেক, চকোলেট, সন্দেশ, রসোগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন বিষবৎ পরিত্যজ্য—আম, কলা, নারকেল প্রভৃতি পুষ্টিকর ফল ; ও কৈ, মাগুর, এই দুটী তৈলাক্ত মাছও খাওয়া বন্ধ করতে হবে। আর ওষুধ হিসাবে খেতে হবে, প্রত্যহ সকালে এক ছটাক আন্দাজ পাতি লেবুর রসে একটু নুন দিয়ে—লেবুর রসটা মেদ-নাশক—তাছাড়া উপবাস হচ্ছে মেদ কমাবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা- একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় পূর্ণ উপবাস যাঁরা রোগা হতে চান তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক—একাদশীর দিন সধবা মেয়েরা একটু মাছ, ভাত অবশ্যই মুখে দেবেন, কিন্তু সে যেন কেবল ঐ নিয়ম রক্ষার্থে মুখে ছোঁয়ানই হয়—পেট ভরে খাওয়া যেন না হয়। —আর একটা জিনিষের উপর দৃষ্টি রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে উপবাসের পরদিনই যেন খুব করে পেট ভরে যা ইচ্ছা তাই না খাওয়া হয় এই ভুলটা অনেকেই করে থাকে বলে উপবাসের কোন ফলই হয় না বরং উল্টো হয়। তাছাড়া কতকগুলি ব্যায়াম করা দরকার, কিন্তু ব্যায়ামের বিষয় আজ আর লিখে জানাবার মত স্থান নেই, তবে যাঁরা এ বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক তাঁরা যদি লিখে আমাকে সে কথা জানান তবে নির্দ্দেশ তালিকা পাঠাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে—তবে দু'একটী সাধারণ ব্যায়ামের কথা এখানে উল্লেখ করছি- যাতে উপকার হতে পারে- ব্যায়াম হিসাবে ছোট ছোট মেয়েদের স্কিপিং করতে দেওয়া উচিত, এতে অনেক উপকার হয়—বড় বড় মেয়েরা ওঠ-বস এবং সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামা-ওঠা কয়েকবার করে পরে যদি বাড়ীর ঝি বা কোন আত্মীয়র দ্বারা কিছুক্ষণ অঙ্গমর্দ্দন করাতে পারেন, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলা চলে 'মাসাজ' করা, তাহলে মেদ নাশের পথে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারবেন।

কৃশাঙ্গীদের প্রতি নির্দ্দেশ :

স্থূলতা যেমন সৌন্দর্য্যের হানিকর তেমনি কৃশতাও আবার নারী সৌন্দর্য্যের এক প্রধান শত্রু ! তবে ইচ্ছা থাকলে ধৈর্য্য ও চেষ্টার দ্বারা একেও স্থূলতার মতই নাশ করা যায়—এক্ষেত্রে চিকিৎসা যে স্থূলাঙ্গীদের চিকিৎসার ঠিক উল্টো সে কথা বলাই বাহুল্য—। পুষ্টিকর খাদ্য, বিশ্রাম, চিত্তের প্রফুল্লতা, আলো ও মুক্ত বাতাস কৃশতা নাশের প্রধান উপায়— কৃশাঙ্গিনীর প্রতিদিন পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দুধ পান করা উচিত—আর আহার করা উচিত লঘু কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য—ডিম সিদ্ধ, ডিমের ঝোল, টাটকা মাংসের রান্না, কচি পাঁঠা ও (যাঁদের

আপত্তি নেই) মুরগীর মাংস, কই মাগুর ইত্যাদি মাছ, আতপ চালের ভাত, যাতার ভাঙ্গা আটার রুটী, এবং প্রত্যহ কিছু টাটকা শাক্, সবজি, ও ফল, আঙ্গুর, আপেল, বেদানা, মর্ত্তমান কলা এবং সন্দেশ ও অন্যান্য মিষ্টান্ন কৃশাঙ্গী মেয়েদের আহার করা উচিত—। কলা, দুধ ও মাখন এ তিনটী এক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী ও আবশ্যকীয়। প্রতি দিন এ তিনটী আহার করা চাই। কিন্তু বেশী নুন ও ঝাল দেওয়া রান্না খাওয়া চলবে না। ও দুটোই কৃশতার সহায়ক—তাছাড়া কৃশতা নাশক ব্যায়ামও আছে অনেক—এ ব্যায়াম শরীরের বিভিন্ন অংশকে পরিপুষ্ট করে তোলে - কিন্তু এ বিষয় রোগা মেয়েদের বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার যাতে উল্টো ব্যায়াম করে শরীরকে আরও ক্ষীণ না করে ফেলেন--যাঁরা স্বভাবতই কৃশাঙ্গী তাঁদের বিশ্রামের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা উচিত। সারা দিনের মধ্যে ২॥০ থেকে তিন ঘণ্টা না ঘুমলেও বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া এবং রাত্রে ৮ঘণ্টা ঘুম অবশ্যই দরকার।

জানেন কি ?

যে কোন একটী এক রঙা পুরোণ জামার হাতে ও গলায় বিরোধী রঙের কফ্‌ ও কলার বসিয়ে তাতে এমব্রয়ডারি করে দিলে অনায়াসেই সেই কয়েক বছরের পুরোণো জামাটিকে সম্পূর্ণ নতুন করে তোলা যায় ?

এক টুকরো ৮৷১০ ইঞ্চি জরি বা সিল্কের পাড় যা কোন জামার হাতে গলায় বসাবার পক্ষে যথেষ্ট হবে না, তাকে জামাটির পিঠের মাঝখানে লম্বা ভাবে (উপর থেকে কোমর পর্য্যন্ত) বসিয়ে দিলে চমৎকার দেখতে হবে ?

কোন সাড়ী ভাল অবস্থায় বহু জায়গায় দাগ ধরে গেলে কিম্বা পোকায় কেটে দিলে সেই দাগ বা কাটা ঢেকে এবং সাড়ীটির গোটা গায়ে কয়েকটী সিল্ক বা সাটীনের ফুল 'এপলিকে' করে বসিয়ে দিলে সেটী পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী হবে ?

কোন কোন সাড়ীর পাড় ভাল থাকলেও সাড়ীর জমি ছিঁড়ে গিয়ে সেটী আর পরবার উপায় থাকে না— যদি পাড়টী সুন্দর হয় তবে সেটীর উপর এক ইঞ্চি কাপড় রেখে কেটে নিয়ে আর ৫॥০ গজ সাদা ভয়েল কিনে তাতে পাড়টী চেপে বসিয়ে সেলাই করে দিলে একটা সম্পূর্ণ নতুন সাড়ী অতি অল্প খরচে তৈরী হতে পারে ?

যে ক্ষেত্রে পাড় নষ্ট হয়ে গিয়ে সাড়ী ভাল থাকে সেখানে রঙিন সাল্যু বা মোটা সুতি কাপড় ১॥০ গজ কিনে সরু সরু করে কেটে সেগুলি জুড়ে জুড়ে সুন্দর পাড় তৈরী করা যেতে পারে ?

পরিচয়

গ্রন্থ

বিচিত্রা—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মৈত্র, প্রকাশক : ভারতী ভবন, ১১, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র কবি হিসাবেই সমধিক খ্যাত; তাঁর মৌলিক ও অনুবাদ কবিতার প্রাচুর্যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য যে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হ'য়েছে, একথা অনস্বীকার্য। এই বৃদ্ধ বয়সেও শ্রীযুক্ত মৈত্র যে অপূর্ব নিপুণতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর কলম চালিয়ে চ'লেছেন, সে কথা ভাবলে বিস্মিত না হ'য়ে পারা যায় না। প্রধানত কবি হ'লেও শ্রীযুক্ত মৈত্রের গদ্য রচনায় হাতও কম পাকা নয়; তাঁর গদ্য রচনার প্রথম নিদর্শন আমরা পুস্তকাকারে পেয়েছি তাঁর 'মরাপালক' নামক গল্পের বইয়ে। এ বইখানাতে তিনি প্রমাণ ক'রেছেন যে উৎসাহ ও প্রেরণা পেলে তিনি উচ্চাঙ্গের গল্প রচনাও করতে পারেন। তাঁর দ্বিতীয় গদ্য-গ্রন্থ 'বিচিত্রায়' দেখলাম যে তিনি একজন শক্তিশালী প্রাবন্ধিকও বটেন।

'বিচিত্রায়' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্বে নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং তখনই এগুলি পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত মৈত্র সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে এগুলিকে উদ্ধার ক'রে একত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ক'রে আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হ'য়েছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিভাগ যে মোটেও সমৃদ্ধ নয়, একথা বোধ হয় সর্ব-জন স্বীকৃত। এদিক থেকে 'বিচিত্রা'কে আমরা অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না। এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখতে চাই : 'বিচিত্রা'র প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে বার বার করে মনে হচ্ছিল যে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য শ্রীযুক্ত মৈত্রের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করতে পারে। তিনি প্রবীন বিজ্ঞানবিৎ; ভাল বৈজ্ঞানিক রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে। 'বিচিত্রা'র প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনি যে সাহিত্য রস সঞ্চার করেছেন, সেই সাহিত্য-রসে সিঞ্চিত করে তিনি যদি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন, তবে বাংলা সাহিত্যের একটা স্থায়ী অভাব কিছু পরিমাণে অন্তত ঘুচতে পারে। এদিকে শ্রীযুক্ত মৈত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে সুখী হবো।

যাক্, এবার বিচিত্রার সমালোচনা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রায় ষোলটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। তন্মধ্যে সাহিত্য-সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করলাম। এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমার সব চেয়ে ভাল লাগল আধুনিক সাহিত্যের উৎস-মূল, প্রগতি সাহিত্য, কাব্যে অনুবাদ, সাহিত্যে শুচিতা ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-পরিচয়। সাহিত্য সমালোচনায় শ্রীযুক্ত মৈত্রের সূক্ষ্ম রসবোধ, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর ঐকান্তিকতা পাঠককে মুগ্ধ না করে পারে না।

এটা খুবই সুখের কথা যে সুপ্রবীণ গ্রন্থকার সাহিত্য সমালোচনায় কোথাও গোঁড়ামির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি : বিরুদ্ধ মতের প্রতি তিনি কোথাও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি। এই পরমত-সহিষ্ণুতা তাঁর প্রবন্ধ রচনায় একটি বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বিচার করেছেন, তার সঙ্গে আমাদের মতের মিল না থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু প্রবন্ধগুলির সাহিত্যিক মূল্য তাতে কিছু মাত্র কমে না। আরেক জাতীয় রচনা এতে স্থান পেয়েছে. এগুলি প্রধানত লেখকের পরিচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিশেষের স্মৃতি কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই জাতীয় রচনার মধ্যে শান্তিনিকেতন বিষয়ক প্রবন্ধ ছুটি, শিবনাথ শাস্ত্রী ও শরৎ স্মৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরী জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধছুটিও উপভোগ্য হয়েছে।

মোট কথা, 'বিচিত্রা' শ্রীযুক্ত মৈত্রের সার্থক গদ্যরচনা ও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিচিত্রার আসন কায়েমী হবে। গ্রন্থকারের গদ্য রচনা রীতিও অনন্যকরণীয়, কবি মনের রসে সিঞ্চিত গদ্যের সঙ্গে এসে মিশেছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ। তদুপরি আছে শ্রীযুক্ত মৈত্রের সরল লঘু হিউমার। সব কিছুর সংমিশ্রণে তাঁর গদ্য রচনাগুলি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মুদ্রন-পারিপাট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক থেকেও বিচিত্রা মার্জিত রুচির পরিচায়ক। প্রবন্ধ-প্রিয় পাঠক সমাজে বইখানি আদৃত হলে সুখী হবো।

গোপাল ভৌমিক

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

শ্রীযুক্ত দীনেশ মুখোপাধ্যায় রচিত আলোচ্য গ্রন্থটি সময়োপযোগী। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে-কাহিনী খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন তাহা শিশুমনের আকর্ষণের বস্তু। রবীন্দ্র-জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া এক একটি অংশ লইয়া তিনি যে-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ছোটদের নিকট রবীন্দ্রনাথকে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় বংশ পরিচয়, শিশু রবীন্দ্রনাথ, মনের খেলা, বাল্য জীবন, ঘরে-বাইরে, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বকবি-রবীন্দ্রনাথ, শিশু ও কল্পনাজগৎ, শিশু রূপজগৎ, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র-প্রতিভা—এই কয়টি বিভাগে এই গ্রন্থ বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্নমুখী প্রতিভা, তাঁহার কর্মময় জীবন ইত্যাদির আলোচনা দ্বারা শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তব্য যে-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে ছোটদের সহিত এই মহামানবটির ঘনিষ্ঠ পরিচয় সহজে সংঘটিত হইবার কথা। আমরা সর্বান্তকরণে এই গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার কামনা করি।

সুনীল রায়

চিত্র

কোর্টডান্সার

ওয়াদিয়া মুভীটোন চিত্র-প্রতিষ্ঠানের প্রথম ইংরাজী চিত্রার্ঘ্য। এতে অভিনয় করেছেন সাধনা বোস, পৃথ্বীরাজ, জাল খাম্বাটা প্রভৃতি। বিদেশী ভাষায় চিত্র গ্রহণ দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নাই। তবুও এর একটা সার্থকতা আছে। বিদেশীর চোখের সামনে আমাদের সমাজ-জীবনের ছবি, আমাদের রীতি নীতির পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

আলোচ্য চিত্রের সমাজ জীবন থেকে যদিও আমরা কয়েক শত বছর এগিয়ে এসেছি এবং বর্ত্তমান সমাজের কোন ছাপ যদিও এতে পড়েনি, তবুও চিত্রের কাহিনীতে এমন একটা বিশ্বজনীন আবেদন আছে যা দেশ ও জাতিনির্বিশেষে সবারই মনকে স্পর্শ করে। এদিক দিয়ে কাহিনীকারের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে।

অভিনয়াংশে শ্রীমতী সাধনা বোস আমাদের মুগ্ধ করেছেন। তাঁর সংযম, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয় দক্ষতা ও নৃত্য কুশলতা—সব কিছুই দর্শকের মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। রাজনর্ত্তকী ইন্দ্রাণীরূপে তাঁর অভিনয় বহুদিন আমাদের মনে থাকবে, বিশেষ করে রাজকুমার চন্দ্রকীর্ত্তির প্রেম অস্বীকার করায় এবং পরিশেষে তাঁর আত্মত্যাগের দৃশ্যটি। বৈষ্ণবকুল প্রধানরূপে জালখাম্বাটার সংযত সহজ অভিনয় প্রশংসনীয়। বাংলা সংস্করণে অহীন্দ্রবাবুর তুলনায় তাঁর অভিনয় কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। খাম্বাটা মহাশয় নিজেই Dialogue Director ছিলেন। তাঁর অনাড়ষ্ট, বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ লক্ষণীয়। পৃথ্বীরাজের চন্দ্রকীর্ত্তি-চরিত্রের রূপদান আমাদের ভাল লেগেছে, বিশেষ করে' বাংলা সংস্করণে জ্যোতিঃপ্রকাশের তুলনায়। সেনাপতি টায়া এবং অন্যান্য আর কারো অভিনয় কাহিনীর গতিকে একটু আড়ষ্ট করে নি। চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসনীয়। চিত্রের বিদেশী রূপান্তরে সঙ্গীতেরও যে রূপান্তর ঘটেনি এটা আনন্দের কথা এবং এজন্য প্রযোজক ও পরিচালক উভয়েই ধন্যবাদ দাবী করেন। পরিচালক মহাশয় ইংরাজি সংস্করণে অনেক অবান্তর জিনিষ বাদ দিয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। এইরূপ কাটছাট হলে বাংলা চিত্রটিও বোধ [illegible] আরো বেশী উপভোগ্য হত। এই দুঃসাহসী কাজে ব্রতী হয়ে প্রযোজক ওয়াশিয়া মহাশয় যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অ, ভ,

মঞ্চ

মায়ের দাবী

বিবাহের আগে অশোক ও করুণার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। একটি অসতর্ক মুহূর্ত্তে অশোকের সামনে করুণার মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং স্বামী বিকাশ তা শুনতে পায়। ফলে, করুণাকে স্বামী ও একমাত্র পুত্র রেখে স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করে যেতে হয়। দীর্ঘ পনর বছর পরে বুলাকী প্রসাদকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করুণাকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখা যায়। আসামীর পক্ষ সমর্থন করল বিমল—করুণারই ছেলে। অবশেষে কারাগারের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে স্বামীর কোলে মাথা রেখে ও ছেলেকে বুকে নিয়ে করুণা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মায়ের দাবী নাটকের আখ্যানভাগ মোটামুটি এইরূপ।

বিকাশ ও করুণা এই দুইটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন দুর্গাদাস ও শান্তিগুপ্তা। শান্তিগুপ্তার অভিনয় সুন্দর। তার দৃপ্ত অথচ সংযত ভঙ্গী করুণার স্বাভাবিক আভিজাত্য বোধ ও তীব্র আত্মসম্মান জ্ঞানকে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার অচঞ্চল নির্ব্বিকার স্থৈর্য্য

এবং তার পরের দৃশ্যে পুত্রকে বুকে তুলে নেবার অদম্য আকুলতা একই সঙ্গে অন্যায়-লাঞ্ছিতা স্ত্রী এবং তৃষিত মাতৃ হৃদয়ের অভিমান ও আকুলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ। এখানে তাঁর অভিনয় অভিনয় বলে মনে হয় না।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বেশী লেখা বাহুল্য। তাঁর অপূর্ব কণ্ঠস্বর, অদ্ভুত বাচনভঙ্গি এবং সংযত অভিনয় রঙ্গমঞ্চে একজন শ্রেষ্ঠ নটরূপে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বিকাশের চরিত্র রূপায়নেও তিনি তাঁর পূর্ব্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। সব চাইতে আমাদের ভাল লেগেছে বুলাকীপ্রসাদের ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ীর অভিনয়। নাট্যকার যেন নিজ সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে Identify করেছেন—তাঁর অভিনয় এত স্বাভাবিক ও সুন্দর। মিষ্টি ব্যবহারের মুখোস ঢাকা শয়তানের আসল রূপটি তিনি চমৎকার ফুটিয়েছেন। অঞ্জলি রায় নাট্যজগতে নবাগতা হলেও তার ভাব প্রকাশ সুন্দর, অভিনয় জড়তাহীন। সরমার ভূমিকায় তার অভিনয় দেখে মেয়েটীর ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে মনে হয়। আমরা তার উন্নতি কামনা করি। 'মায়ের দাবী'র কাহিনী স্বচ্ছন্দ ও জমাট। পাত্রপাত্রীদের মুখে বড় বড় বুলি বসিয়ে, কাহিনীর গতিকে ব্যাহত না করে নাট্যকার সুবিবেচনার ও সামঞ্জস্য বোধেরও পরিচয় দিয়েছেন। বহুদিন পরে একখানি সত্যিকারের ভাল নাটক আমাদের পরিবেশন করার জন্য নাট্যকারকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অমিয় ভট্টাচার্য

নৃত্য

উদয়শঙ্কর ভারতীয় কৃষ্টিকেন্দ্র

ভারতীয় নৃত্যকলার ঐতিহাসিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে সেই পুরাকালীন বৈদিক যুগ থেকেই, রাজন্যবর্গের এবং জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা থেকেই এর উৎপত্তি ও ক্রমবর্দ্ধন। এই পুরাকালীন শিল্পটির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও চর্চাকেন্দ্র ছিল, সেখান থেকে তাদের সুস্পষ্ট রীতি ও ছন্দ, ধারা ও পদ্ধতি নানা দিকে প্রসারিত হয়ে পড়ত। ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম যে পরিবর্ত্তনের যুগ এসেছিল, তার ঠিক পূর্ব পর্যন্ত এই শিল্পের ধারা ছিল অব্যাহত। আধুনিক ভারতবর্ষ হচ্ছে ঝটিকাচ্ছন্ন তামসী রাত্রির নির্মল প্রভাত। যেমন করে একদিন আয়র্লণ্ডের সাহিত্যিক আবর্ত্তন হয়েছিল লোক-সাহিত্য ও ভুতুড়ে গল্প থেকে, তেমনি করে ভারতবর্ষ আপনার প্রাণকে পুনরাবিষ্কৃত করতে চেষ্টা করছে বিস্মৃত অতীতের ধ্বংসস্তূপ থেকে। তাই কয়েকজন শক্তিশালী শিল্পী মৃতপ্রায় শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করবার প্রচেষ্টায় যত্নবান হয়েছেন, এবং তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন উদয়শঙ্কর। সম্পূর্ণ আদর্শবাদী এবং বলিষ্ঠ কল্পনাকারী হচ্ছেন শঙ্কর, যিনি অন্তরে একজন দুঃসাহসী বাস্তবপন্থী ও অক্লান্ত কর্মী। তাঁর সেই বহুদিন থেকে দেখে আসা স্বপ্ন—যত্নবর্ধিত কল্পনা, আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি ও কার্যতালিকা নিয়ে 'দি ইণ্ডিয়া কালচার-সেণ্টার' আপনার দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে নৃত্য ও সঙ্গীত এই প্রতিষ্ঠানে একটি

বিস্তৃত ও ব্যাপক ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। কেবলমাত্র ভারতীয় আর্টের পুনরুদ্ধারসাধনই এর উদ্দেশ্য নয়
এর উদ্দেশ্য জাতীর ধারা অক্ষুণ্ণ থেকেও যাতে ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার প্রতি সতর্ক
দৃষ্টি রেখে সঙ্গীতের সম্পূর্ণ প্রাচ্যদেশীয় ভঙ্গীর অনুবর্ত্তন ও নব নব সৃষ্টি। এই সংগে কথাকলির শ্রেষ্ঠ
কলাবিদ্ গুরু নম্বুদ্রি, ভরত-নাট্যের অন্যতম সুযোগ্য পণ্ডিত কেন্দপ্পা পিল্লাই, সুবিখ্যাত ওস্তাদ্ আলাউদ্দিন
খাঁ সাহেব প্রমুখ শিক্ষকদের শ্রম ও সাহচর্য পাওয়া এই শিল্পকেন্দ্রের একটা সৌভাগ্য বলতে হবে।

উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা এবং জনসাধারণের সহযোগিতা ও অনুমোদন ভিন্ন প্রায় কোনো
আর্টেরই উন্নতিলাভ ঘটে না। শঙ্কর এই দিক দিয়ে পূর্ণ অনুমোদন এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের
পৃষ্ঠপোষকতা পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। বরোদার মহারাজা পাঁচ বৎসরের জন্য একটি
নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি এই কেন্দ্রের জন্য নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন এবং যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট ও
এতদুদ্দেশ্যে পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন। আজকাল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই
দান এই কেন্দ্রেস্থিতি ও উন্নতির পক্ষে একেবারে কম নয়।

খুব বেশী দিন গত হয় নি, যখন বিভিন্ন নৃত্যশিক্ষক ও তাঁদের নৃত্য-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব
বর্ত্তমান ছিল। এখনো ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে তাদের দেখা পাওয়া যায়, সুস্পষ্ট ভাব ও
আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে,—কিন্তু যুগোপযোগী তারা যথেষ্ট উন্নত ও আধুনিক নয়। উদয়শঙ্করের
এই 'কালচার সেণ্টার'—অনুবর্ত্তনের মূল উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে,
এর বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলির পুনরাবিষ্কার করে তাদের থেকে সৃষ্টিমূলক অনুচেষ্টায়। সূর্য্যের ছড়ানো
সমস্ত রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে, যাতে করে শিল্পকলার জ্যোতিঃ পুনরুদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারবে।
এ হ'চ্ছে একটা বিরাট কর্ম, যা নূতন, যা মহৎ, যা গৌরবময়,—একটা অদম্য উৎসাহ, শক্তি ও
অনুপ্রেরণায় যা সমুজ্জ্বল। আর শঙ্কর হচ্ছেন একমাত্র সেই কর্ম্মী, যার মাঝে এমনই একটা অদম্য
অনুপ্রেরণা জেগেছে।

কিছুদিনের অক্লান্ত চেষ্টার পর ভারতীয় কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় সঙ্গীত বিদ্যা
একটা সামান্য কোনমাত্র অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু নৃত্যকলার স্থান এখনও সেই বহির্মহলে,—
যদিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ লাভ করবার যোগ্যতা এর বিন্দুমাত্র কম নয়। ঐতি
হাসিক দৃষ্টি নিয়ে বলতে গেলে, পাশ্চাত্যদেশই ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ থেকে এই আন্দোলনের সুরু করে
এবং Fokine Digghilaff Massine Nijniska প্রমুখ কলাবিদ্‌গণের চেষ্টায় অভাবিত উন্নতি ও
করে এবং আজকাল এই শিল্প মধ্য ও দক্ষিণ দেশসমূহে বিরাট প্রসার লাভ করেছে। ভারতবর্ষেও আজ
এমনই এক সমুন্নত ও সুযোগ্য চর্চ্চাকেন্দ্রের প্রয়োজন। সেই দিনের আর বেশী দেরী নেই, যখন ভারতে
রাজকীয় নৃত্য প্রতিষ্ঠান অথবা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত শিক্ষাকেন্দ্র অথবা জনসাধারণের সহযোগিতা-
প্রাপ্ত নৃত্যপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির যথেষ্ট ব্যাপ্তি লাভ ঘটেছে। সমগ্র কলাজগতের আদর্শ অনুসরণ করে
শীঘ্র একদিন ভারতও তার শিল্প-মিউজিয়াম অথবা শিল্প-সম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করবে। এগিয়ে যাওয়া
জগতের কাছে ভারতও পিছিয়ে থাকবে না—সে জাগবে, যুগের অগ্রগতির সংগে সমান তালে পা ফেলে

আপনার জাতীয় ধারা ও কৃষ্টি নিয়ে সে এগিয়ে চলবে। অতীত ও বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য রেখে এক অভাবিত ও গৌরবময় ধারানুবর্ত্তনই তার আদর্শের মূল পরিচিতি। উদয়শঙ্কর হচ্ছেন এই আদর্শানুসরণকারী এক শক্তিশালী কর্মী, জাতীয় সংগঠন যার উদ্দেশ্য, জাতিকে বড়ো করা যার সঙ্কল্প, ভারতীয় আর্টের ভবিষ্যতে একটা নূতন কিছু অবদানের জন্যই তিনি আজ তাঁর শিল্পচর্চার কয়েক পা অতীতে পিছিয়ে গেছেন.—তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে পুনর্জীবন, নবজীবন ও সংগঠন।

শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রুক্মিণী দেবী—কলারসিক ব্যক্তিমাত্রের নিকটই আনন্দের সংবাদ যে দক্ষিণভারতের সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী শীঘ্রই শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের উদ্যোগে নৃত্য প্রদর্শনের জন্য নিখিল ভারত সফরে বাহির হইবেন। ভারত নাট্যে রুক্মিণীদেবীর পারদর্শিতা অসাধারণ।

বাল্যকাল হইতেই রুক্মিণী দেবী শিল্পের প্রতি অনুরক্ত, প্রথম জীবনে তাঁহার সঙ্গীতজ্ঞ হইবার অভিলাষ প্রকাশ পায়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২৯এ ফেব্রুয়ারী ইনি মাদুরার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ আরেণ্ডেলের সঙ্গে এঁর প্রথম সাক্ষাত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আরেণ্ডেলের সঙ্গে ইনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন্। এই বৎসরেই সর্ব্বপ্রথম ইনি ডাঃ বেসান্তের সঙ্গে পরিচিত বহন্। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ আরেণ্ডেলের সঙ্গে রুক্মিণী দেবী ইউরোপ ভ্রমণে বার হন্। তিনি সেখানে ঘোরতর ভাবে বৈদেশিক আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলেও নিজস্ব স্বদেশী বৈশিষ্ট্য তাঁহার জায় থাকে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় যান। সেখানে আনা পাবলোভার সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের মধ্য দিয়াই রুক্মিণী দেবীর ভবিষ্যতের নৃত্য পারদর্শিতা জাগিয়া উঠে। ১৯২৬ হইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে ডাঃ আরেণ্ডেল ও রুক্মিণীদেবী দেশবিদেশ ভ্রমণ করেন।

১৯৩৫ সালে তিনি নৃত্যশিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহার জীবনে এইখানেই নব যুগের সূচনা। তাহার পর হইতেই আমরা তাঁহাকে বিশিষ্ট নৃত্যকুশলী হিসাবে পাইয়াছি।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যে আমরা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার নৃত্য দেখিতে পাই। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে আমরা তাঁহার শিল্পজীবনের আরম্ভ বলিতে পারি। ইতিমধ্যেই তিনি ভারতনাট্যে যে অসাধারণ কুশল হইয়া নিজ খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন—তাহা তাঁহার শক্তির পরিচায়ক।

আমরা একান্ত প্রার্থনা করি—তিনি তাঁহার বর্ত্তমান বর্ষের অনুষ্ঠান হইতে নিজ খ্যাতি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

মঞ্জু সেন

সম্পাদকীয়

ইনভিজিব্‌ল আর্মি নামক পৃথিবীব্যাপী বিশাল এক অদৃশ্য সেনাবাহিনী গঠন করার প্রস্তাব যখন পাশ হ'লো — তখন আমরা এ পরিকল্পনাটির অর্থ ঠিক বুঝতে পারি নি। ক্রমশ সেই অদৃশ্য বাহিনী যখন দৃশ্যমান হ'য়ে উঠলো, তখন আমরা অর্থটি সঠিক বুঝলুম। প্রকৃত পক্ষে, কোনোকিছু বুঝতে আমাদের একটু দেরী হয়। এই বাহিনীর চিহ্ন ' V ' অক্ষরটি। Defence SaVing Certificateএ, Police HoVseএ V অক্ষরটি এতদিন অদৃশ্য ছিলো, আজকাল স্পষ্ট দেখা দিচ্ছে।

আমাদের পত্রিকার প্রচ্ছদপটেও V চিহ্ন আঁকা আছে। সুখের বিষয় আমাদের শিল্পী ভোলাদা (ভোলা চট্টোপাধ্যায়) ইনভিজিব্‌ল আর্মিতে নাম লেখাবার আগে থেকেই V. C. (অবশ্য ভিক্টোরিয়া ক্রস্ নয়) ব্যবহার করেন। আমাদের পাঠক পাঠিকা পৃষ্ঠপোষক পোষিকা ইত্যাদি সকলে বিজয়ার অভিনন্দন Vijaya Greetings হিসাবে গ্রহণ করবেন। এ-ছাড়া V চিহ্ন ব্যবহারের সুযোগ আমাদের নেই।

আমরা উক্ত চিহ্ন ব্যবহার করতে চাই ব্যবসায়বুদ্ধিপ্রণোদিত হ'য়ে। Veedol প্রকাণ্ড V ব্যবহার করছে, বাল্‌ব্যবসায়ী লিখছে V for Victory, O for Osram, আমাদের নাচঘরের প্রত্যেকটি সাজঘর তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও একটিও V পাওয়া গেল না। কেবলমাত্র ভোলাদার কৃপায় চিহ্নটি কোনোরকমে প্রচ্ছদপটে এঁকে রাখা গেছে। আশাকরি আমাদের ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের পথে ঐ চিহ্নটি যথেষ্ট সাহায্য করবে। তা ছাড়া আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করছি, তাঁর সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ ছাপছি তা রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসে নয়; ওর পেছনে আমাদের বণিক-মন আছে। আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে জুড়ে দিলে আমাদের পণ্যকে বিখ্যাত করে তুলতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। পূজা সংখ্যার পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় বাঙলার তিনটি গৌরবের বস্তুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আপনারা পেয়েছেন, আপনাদের ও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ কম গৌরবের বিষয় নয়; প্রথম গৌরব দুর্গোৎসব, দ্বিতীয় গৌরব রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় গৌরব কেশ তৈল। কাপড়ের মিল রবীন্দ্রনাথের সচিত্র বাণী প্রচার ক'রেছে: 'ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।' এবং যাঁরা এ-ভাবে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করার সুযোগ পাননি, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা প্রকাশ ক'রেছেন!—যাঁদের অটোগ্রাফের খাতায় রবীন্দ্র-

নাথের দু'চার কথা রচনা লিপিবদ্ধ আছে, তাঁরা এবার থেকে সজাগ হ'ন্, তাঁরা আমাদের মত ব্যবসায়বুদ্ধিপ্রণোদিত হন্। Nobilityর অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়েই হয়ত ইংলণ্ডের লেখক (Lord John Manners) লিখেছিলেন :

> " Let wealth and commerce, laws and learning die,
> But leave us still our old nobility "

আজ Commerceএর উৎপীড়নে উল্লসিত হ'য়ে আমরা কী লিখবো তাই ভাবছি। আচার্য রায় বলেন, বাঙালী ব্যবসা জানে না। আমরা বলি, আচার্য রায় বাঙালীকে জানেন না। সুযোগ মাত্র একটিবার আসে— এমনি একটা ইংরাজী প্রবাদ আছে, আমরা বাঙালী, আমরা জেনেছি— রবীন্দ্রনাথ মাত্র একটিবার মারা যান্।

V নিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি চোখে পড়ছে। ফলে, রবীন্দ্রনাথ ছোট হ'য়ে যাচ্ছেন এবং V বড় হ'য়ে যাচ্ছে। বড় ক'রে না দেখালে বিজ্ঞাপন জোরালো হয় না। যাঁরা V গলা জামা গায়ে দেন্, আশা করি তাঁরা V-এর আকার আরো বড় করবেন, এই সুযোগে তাঁদের বিজ্ঞাপনও আমরা ভালো ক'রে দেখে নিতে পারবো— এই আশাতেই আমরা রাস্তা হাঁটছি! বলা বাহুল্য, বিজ্ঞাপনের আমরা বড় ভক্ত। পত্রিকা ব্যবসায় বিজ্ঞাপন না হ'লে চলে না। মহামানবেরা একই ভাবে নাকি চিন্তা ক'রে থাকেন। সন্দেহ ছিলো। সে সন্দেহ ভঞ্জন হ'য়েছে। সমুদ্রের ওপার থেকে V আসার পর, এপারে P শুরু হ'য়েছে। পাকিস্থান-পন্থীরা এবাব P চিহ্ন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রেছেন। স্বরাজ-পন্থীরা এবার S, স্বাধীনতা পন্থীরা I, হিন্দুমহাসভা অবশ্য Hএর জন্যে ঝুলোঝুলি করবেন। মনে ক'রে নেওয়া যাক্, ওদিকে জার্মানী ইটালী রুমানিয়া ফিনল্যাণ্ড নরোয়ে ইত্যাদি দেশের অধিবাসীরা Vএর অনুরূপ অক্ষর গ্রহণ ক'রেছে। তার সঙ্গে আরো ধ'রে নেওয়া যাক্, সবার মনোবাঞ্ছা সমভাবে পূর্ণ হ'লো। New World Order আনার জন্যে তাহ'লে এই অনাবশ্যক রক্তপাত কেন? প্রথম থেকে প্রত্যেকের কামনা অনুযায়ী একটি ক'রে অক্ষর গ্রহণ করাই উচিত ছিলো। সত্যি, সামান্য খেয়ালের অভাবে কী অঘটনই না ঘটে!

●

[আজ সকালে জনকয়েক কমরেড চাঁদার বাক্স হাতে ক'রে সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়েছিলো। রাশিয়াকে বাঁচাবার জন্যে অর্থ সাহায্য চায়। কথাটা বেখাপ্পা শোনালো। কারণ তার আগেই রাশিয়ার অবস্থা কাগজে দেখেছি। কি ভাবে বাঁচানো সম্ভব জানতে চাইলাম। শুনলাম, রাশিয়া নাকি অনেকগুলো স্যাণ্ড-ব্যাগের অর্ডার দিয়েছে ভারতবর্ষে, সেই বস্তার দামটা কমরেডটা এখান থেকেই দিয়ে দেবে। কথাটা শুনতে ভালো লাগলো। কিন্তু স্যাণ্ড-

ব্যাগ দিয়ে মরুভূমি রক্ষা করা হবে, না, সহর বাঁচানো হবে তা বোঝা গেলো না। বাঁচাবার মত সহর রাশিয়ার হাতে স্যাণ্ড-ব্যাগ পৌঁছান পর্যন্ত থাকলে ভালো। কারণ, সকালের কাগজে প্রকাশ, আরো তিনটি সহর জার্মানরা হস্তগত ক'রেছে। কমরেডরা আমার কথা শুনে হাসলো। বুঝলো, আমি একেবারেই বাঙালী, কারণ তাদের ওস্কানিতেও আমার রক্ত গরম হ'লো না, নির্বিকার ব'সে নৈরাশ্যের কথাই বলছি। তারা বললো, 'আপনি কি ভাবছেন মস্কো ফল্ করলেই রাশিয়ার যুদ্ধ থেমে যাবে?' কিছুই ভাবিনি ও বিষয়, বাক্সটা এগিয়ে ধরতে বললাম। যাবার সময় তারা ব'লে গেলো, 'বিপ্লবের ভিতর দিয়েই রাশিয়ার জন্ম, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আবার সে বেঁচে উঠ্‌বে।' বললাম, 'ভালো কথা।'

চাঁদা দেওয়ার পর থেকে আপশোষ হ'চ্ছে। মনে হ'চ্ছে, একেবারে জলে দিলাম। নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে যদি স্যাণ্ড-ব্যাগ দরকার হয় তখন নিউজিল্যাণ্ড থেকে বস্তা আসবে কি না তাই ভাবছি। আমরা উপযাচক হ'য়ে সাহায্য করতে বড় আরাম পাই। বেহারের ভূমিকম্প, আসামের জলপ্লাবন, রাশিয়ার মহাসমর বঙ্গবাসীকে ব্যথিত করে। কিন্তু স্বগ্রামের করিমুদ্দি মিঞার কথা ভাবার সময় হয় না। বেচারার লাঙ্গলের লোহা হয়ত খসে গেছে, বলদ দু'টো হয়ত স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের সকালের অতিথি কমরেডদের সমতুল্য। যে জাতি আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে সর্বপ্রকারে সাহায্য পাবে বা পাচ্ছে, তাকে সাহায্য পাঠাবার কোনো প্রয়োজন আমাদের মতো দরিদ্রের আছে কিনা জানিনে।

বোমা ও যুদ্ধের কথায় ভয় পাই শুনে তারা আমাকে আশ্বাস দিয়ে ব'লে গেলো, 'দৈহিক সাহায্য না হয় না দিলেন; আর্থিক সাহায্য করুন, আপনার অর্থে কেনা বোমা নিয়ে আমরাই এগিয়ে যাব, নাৎসী নিপাত করবো।' শুনে আরাম পেলাম। কিন্তু কে তা'দের বোঝাবে-যে এ-যুদ্ধ বাক্‌যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধক্ষেত্র রঙ্গমঞ্চ নয়, এবং আমার অর্থবল তাদের শারীরিক বলেরই অনুরূপ।

●

অনেকে চমৎকৃত হন এই স্বল্পকালের মধ্যে জার্মানীর বল সঞ্চয়ের কথা ভেবে—গত মহাসমরের পর ধীরে ধীরে এই জাতি কী ভাবে বেড়ে উঠেছে, এবং হিটলারের ক্ষমতালাভের পর মাত্র এই কয়েকটি বছরেই তার কি অসাধারণ স্ফীতিলাভ! কিন্তু সে সময় তাঁরা রাশিয়ার কথা ভাবেন না। এই তো সে দিনের ঘটনা—ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যখন রাশিয়ার লড়াই বাধলো, তখন রাশিয়ার ছিলো কি? না ছিলো সৈন্যবল, না ছিলো রণকুশলতা, না ছিলো এরোপ্লেন। ফিনিশ সৈন্যদের কাছে তাকে কি অপদস্তই

না হ'তে হ'য়েছে। তারপর মাত্র এক কিংবা দেড় বৎসর বাদেই যখন জার্মানীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ আরম্ভ হ'লো—তখন আমরা আমূল পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের রাশিয়াকে পেলাম, পুরু কার্ট্রিজ কাগজে ছাপা ও মজবুত মলাটে মোড়া। সৈন্যবলে, রণনিপুণতায়, এরোপ্লেনের সংখ্যায় তার তুলনা মেলা এখন সহজ নয়। যাঁরা পত্রিকা পাঠ করেন, এবং পুরোনো কাগজ সের দরে বিক্রি করেন না, তাঁরা এই দুই যুদ্ধের সংবাদ পাশাপাশি রেখে যদি পুনর্পাঠ করেন, তা'হলে সহজে আমাদের উক্তির সত্যতা বুঝতে পারবেন।

রাশিয়া জয়ী হোক্— আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা এ ছাড়া আর কী হ'তে পারে ? কেননা, শোনা যায়, সে দরীদ্রের বন্ধু। এবং যে হেতু আমরা ধনিকসম্প্রদায়ভুক্ত নই, রাশিয়ার মঙ্গল আমরা চাই জীবিত বন্ধুলাভের ইচ্ছায়। পঙ্গু ও অথর্ব বন্ধু কারোই কাম্য নয়। অথচ কামনা অনুযায়ী সবসময় সব কাজ করা সম্ভব নয়। 'Thinking is easy ; acting is difficult ; to act in accordance with one's thoughts is the most difficult thing in the world.'— কথাটি জার্মানীর কবি গ্যেটের। আমরা এ কথা স্বীকার করি। অতএব বেপরোয়া চিন্তা করতে ও প্ল্যান করতে আমরা ভরসা পাইনে। যাঁরা এ-কথা অস্বীকার করেন, তাঁরা সৌভাগ্যবান। ইতিহাস পাঠকেরা জানেন যে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁর শাসনকালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলেন। কিছুতেই লড়াই না বাধায় তাঁর ধৈর্য প্রায় সীমা ছাড়িয়েছিলো। গ্ল্যাডস্টোন ছিলেন তুরস্ক বিরোধী, অথচ রাণী ছিলেন রুশ বিরোধী, কেননা— ' it was the question of ' Russia or British supremacy in the world,' তারপর যুদ্ধ বাধলো তুরস্কে আর রাশিয়ায়। এতেও আশ্বস্ত হবার কিছুই ছিলো না। অবশেষে সমরপ্রাঙ্গণ থেকে খবর এলো-যে ৫০,০০০ রুশসেনা মারা গেছে, ৩০,০০০ জখম হ'য়েছে এবং এমন নিকৃষ্ট হাসপাতালে তারা আছে— যাতে ধ'রে নেওয়া যায়-যে তাদের সবাই মরবে। তারপর যখন আরো খবর এলো, রুশ পরাজয় অবধারিত, তখন দেশসুদ্ধ লোক তুরস্কের পক্ষে দাঁড়ালো, কেননা তুরস্ক তার বীরত্ব দেখিয়ে ইংলণ্ডকে মুগ্ধ ক'রেছে এবং ইংলণ্ড বীরের বড় ভক্ত। তুরস্ক বিরোধী গ্ল্যাডস্টোনের জানলায় দরজায় ইঁট পাটকেল পড়তে আরম্ভ করলো।

আমাদের মনে হয় V চিহ্নটি Victory এবং Victoria দুয়েরই প্রতীক। যুদ্ধ না ক'রে প্রবল বিরুদ্ধভাব দেখিয়েই রাশিয়াকে পরাভূত করা গিয়েছিলো। কিন্তু এবার লক্ষ্য রাশিয়া নয়—জার্মানী। জানিনে, এখন লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় আজকের

সকালের কমরেড বন্ধুদের মতো বালখিল্যেরা জাতীয় নিশান হাতে ক'রে ভিক্টোরীয় যুগের লণ্ডনবাসীদের মতন গান গায় কি না :—

" We don't want to fight,
But, by Jingo! if we do,
We've got the ships,
We've got the men,
We've got the money too!"

কিন্তু এ গানের শেষের চার লাইন সত্য হ'লেও, প্রথম লাইনটী সত্য নয়— ইংলণ্ড এবার যুদ্ধ চায়। তার প্রচুর প্রমাণ আছে। তার সঙ্গে আমেরিকাও যুদ্ধ চায়। আমেরি ও আমেরিকা উভয়েই কড়া লোক। দু'জনের চরিত্রে সৌসাদৃশ্য বর্তমান। দেব দিচ্ছি ক'রে দিন কাটানো উভয়েরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। আমরা আদার ব্যাপারী, রাজনৈতিক জলযানের খবর অবশ্য আমাদের রাখার কথা নয়। তবুও যেটুকু কানে আসে ও চোখে পড়ে— তার ওপর নির্ভর ক'রে সামান্য একটু অনুচ্চবাচ্য করলাম মাত্র।

●

আমেরির ও আমেরিকার সাদৃশ্যের কথা যখন উঠে পড়ল, তখন বর্তমানকালের তিনজন দিক্‌পালের আঙ্কিক সাদৃশ্যের একটা নমুনা আপনাদের দেখাতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। আপনারা জানেন, মহারথীদের মধ্যে অনেক সময় অনেক রকমের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন ৭ই আগস্ট, 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীর জন্ম ৭ই আগস্ট, আবার অক্সফোর্ড য়্যুনিভার্সিটি রবীন্দ্রনাথকে উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন যে দিন সে দিনও ৭ই আগস্ট। অনুসন্ধান করলে এ ধরণের আরো অনেক মিল আরো অনেকের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওদিকে তেমন উৎসাহ আমাদের আপাততো নেই। যে তিনজন দিক্‌পালের আঙ্কিক মিল আপনাদের দেখাব বলে কথা দিয়েছি— তাঁরা হিটলার মুসোলিনি ও স্টালিন। এঁদের মধ্যে প্রথম মিল এই-যে এঁরা তিনজনেই ডিক্টেটার, তা ছাড়া অন্য মিলের জন্য নিচের ছক দেখুন—

	হিটলার	মুসোলিনি	স্টালিন
জন্ম সন … … … … …	১৮৮৯	১৮৮৩	১৮৭৯
ক্ষমতালাভের সন … … …	১৯৩৩	১৯২২	১৯২৪
বর্ত্তমান কর্ম্ম জীবন … … …	৭.	১৮	১৬
বয়স … … … … … …	৫১	৫৭	৬১
যোগফল	৩৮৮০	৩৮৮০	৩৮৮০

যোগফল দেখে আপনারা নিশ্চয় সাদৃশ্য বুঝতে পারছেন। ৩৮৮০ সংখ্যাটির অর্ধেক ১৯৪০, ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় বর্ষ অবশ্যই—উপরের হিসাবটিও অবশ্য ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তই। এ আঙ্কিক মিলের আবিষ্কারক, বলা বাহুল্য, আমরা নই ; Julian Hirch নামক একজন উৎসাহী Statistician এর আবিষ্কর্তা।

বিদেশীদের দ্বারা নানাবিধ গবেষণা সম্ভব, আমাদের দেশে সম্ভব নয়। কেননা আমাদের দেশের গবেষকদের আমরা বেকার বলতে জানি। বেকার উপাধি দ্বারা ভূষিত ক'রে যে ভাবে অশ্রদ্ধা প্রকাশের টেকনিক্ আমরা শিখে নিয়েছি, তাতে উৎসাহদানের টেকনিক্ আয়ত্তাধীনে চ'লে গেছে। উপরোক্ত গবেষক তাঁর ডিক্টেটারীয় মিল আবিষ্কার ক'রে দেশের ও দশের হয়ত কোনো কাজে লাগেন নি, কিন্তু তাঁর এই গবেষণা তাঁকে ভবিষ্যতে কোন্ মহত্তর কাজের নির্দেশ দেবে, তা আগে থেকেই বলা যায় না। সে কালে এ-দেশে নিষ্ঠা ছিলো, একালে নেই। কালের দোষ দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ব'সে থাকা চলে না। কালের আচার ব্যবহারের স্রষ্টা মানুষ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমষ্টির কথা ভাবা, পাগলামি। মানুষ দ্বারা যে সমাজ তৈরী হ'য়ে উঠেছে, তার আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত দিন এইভাবেই চলবে। আধুনিক কবিতায় পর্যন্ত সমাজবোধের সূচনা দেখছি ; রক্ত, মেশিন, কলের বাঁশী ইত্যাদি কবিতার উপাদান হ'য়েছে। আধুনিক জীবনে সমাজবোধ সর্বাগ্রে আসা দরকার।